খৃস্টধর্ম, সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মূল

মুফতী মুহাম্মাদ সরওয়ার ফারুকী নদভী

অনুবাদ

মিজানুর রহমান কাসেমী নদভী

মাকতাবা পায়ামে আমন,
লাখনৌ, ইন্ডিয়া

কিতাবের নাম: **খৃস্টধর্ম , সংক্ষিপ্ত পরিচিত**
লেখক: মুফতী মুহাম্মাদ সরওয়ার ফারুকী নদভী
অনুবাদক: মিজানুর রহমান কাসেমী নদভী
সম্পাদনা: সাঈদ আহমাদ খান নদভী
প্রকাশনা: মাকতাবা পায়ামে আমন , লাখনৌ , ইন্ডিয়া
৭৩৭৯৮৯৪৮২৩
সন: ২০২২ ইং

উৎসর্গ

মাতা- পিতা, জীবনের প্রতিটি ক্ষণে আমাকে গঠনে যারা নিজেদের তিলে তিলে শেষ করেছেন। তবুও উৎসাহ দিয়েছেন আজীবন...।

প্রিয় উস্তাদ মাওলানা হিফযুর রহমান দা.বা. এবং উস্তাদ মুফতী সালাহুদ্দীন সাহেব দা.বা.' র প্রতি। যারা আরবী শিক্ষার ফটক থেকেই দ্বীনে ইসলামের জন্যে আমার হৃদয়ে ইশকের বীজ বপন করেছেন...।

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা.....৮
লেখকের ভূমিকা.....১১
খৃস্টানধর্ম.....১৩
হযরত ঈসা আ. এর পুরা নাম.....১৩
পূর্ববর্তী ইহুদীদের ইতিহাস.....১৪
হযরত ঈসা আ. এর জন্ম.....১৫
শৈশব ও যৌবন কাল.....১৬
ওহীর অবতরণ.....১৬
ধর্মপ্রচার.....১৬
হযরত ঈসা আলাইহিস সাল্লাম এর খুতবা.....১৭
শিক্ষাদীক্ষা.....১৮
হযরত ঈসা আ. এর উপর অপবাদ আরোপ.....১৮
শূলীতে চড়ানোর বিশ্বাস ১৯
দ্বিতীয়বার জন্ম লাভ করার আকীদা.....১৯
ইসলামী দৃষ্টিকোণ.....১৯
খৃস্টানদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ.....২০
খৃস্টান ও অন্যান্য ধর্ম.....২২
খৃস্টধর্ম প্রচার.....২৩
হযরত ঈসা আ. এর পরবর্তী সময়.....২৩
খৃস্টানদের উপর জুলুম- নির্যাতন.....২৪
নতুন যুগে খৃস্টান ধর্মের প্রচার- প্রসার.....২৫
ধর্মপ্রচারক ও ধার্মিকদের ব্যাপারে খৃস্টানদের ধারণা.....২৬
পাপমোচন.....২৮

খৃস্টান ধর্মের মৌলিক আকীদাসমূহ.....৩০
১. সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে ধারণা.....৩০
২. ত্রিত্ববাদের আকীদা- বিশ্বাস.....৩০
ফাঁসি.....৩১
৩. নবুওয়াত ও রিসালাতের আকীদা.....৩১
৪. আখেরাত.....৩২
৫. পুনর্জীবন তথা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার আকীদা.....৩২
৬. পবিত্র শূলী.....৩২
৭. কাফফারা.....৩৩
খ্রিস্টান ধর্ম ও মুক্তির পথ.....৩৩
গোনাহের
স্বীকারোক্তি.....৩৩
হযরত ঈসা আ. এর উপর ঈমান.....৩৪
রাহবানিয়্যত (Asceticism) বা সন্ন্যাসবাদ.....৩৫
উপাসনা পদ্ধতি.....৩৫
হযরত ঈসা আ. এর জন্মদিন পালন.....৩৬
Lord's Supper (বা রবের রাতে খানার আয়োজন) ' র ব্যাখ্যা.....৩৬
রোযা.....৩৮
উপাসনার বিভিন্ন রীতি.....৩৯
হামদখানী বা প্রশংসাপাঠ.....৪০
খৃস্টানদের সামাজিক বিভিন্ন রসম- রেওয়াজ.....৪০
মিরাস.....৪২
তালাক.....৪২

(Sacraments) সেক্র্যামেন্টস বা পবিত্র রীতি-
নীতিসমূহ.....৪২
১. Baptism বা দীক্ষাদান উৎসব.....৪৩
এ গোসলের পদ্ধতি.....৪৩
২. ওয়াদা.....৪৩
৩. রবের রাতের খানা.....৪৪
৪. তাওবা ও কাফফারা.....৪৪
৫. রোগীদের মাসীহ.....৪৪
৬. বিবাহ.....৪৫
৭. পবিত্র নিয়ম.....৪৫
খ্রিস্টান ধর্মের গ্রন্থসমূহ.....৪৬
ওল্ড টেস্টামেন্ট.....৪৬
আহাদ নামা জাদীদ বা নিউ টেস্টামেন্ট.....৪৬
চার ইঞ্জিল.....৪৭
চার ইঞ্জীলের বিস্তারিত বিবরণ.....৪৮
ইঞ্জীলে ইবিউনিউ এর বর্ণনা.....৫২
ইঞ্জীলে বারনাবা.....৫২
এ যুগে নতুন প্রজন্মের জন্য বাইবেলের বিভিন্ন অংশ.....৫৪
পলের চিঠি.....৫৪
ইউহান্নার চিঠিসমূহ ও তার বই মুকাশিফাত.....৫৫
ইঞ্জীলসমূহের সত্যতা ও সঠিকতা.....৫৬
খ্রিস্টানদের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও দলসমূহ.....৫৯
একত্ববাদী গ্রুপ.....৫৯
মাকদুনিবাস (মেসিডোনিয়া) গ্রুপ.....৫৯
নাস্তোরিয়্যীন (নাসতোর গ্রুপ).....৬১
খৃস্টানদের মাঝে মতপার্থক্যের মূল কারণ.....৬৩

বর্তমানে খৃস্টানদের বড় বড় প্রধান তিনটি দল.....৬৪
১.ক্যাথলিক.....৬৪
২. প্রোটেস্ট্যান্ট.....৬৬
Even Gelicalism বা মিশনারী সোসাইটির ধর্ম প্রচার.....৭৪
৩. অর্থোডক্স.....৬৭
অর্থোডক্সদের আকীদা- বিশ্বাস.....৬৮
মেরোনিয়া.....৬৯
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব.....৭১
১. ক্রিসমাস.....৭১
২. ইস্টার.....৭১

অনুবাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইসলামের মূল শিক্ষা হলো , এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন স্রষ্টা নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল । ইসলাম ধর্মের গ্রন্থানুযায়ী , এটি আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা । সুখ- শান্তি আর নিরাপত্তায় ইসলাম একটি সর্বজনীন ধর্ম । কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে ,

" و من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ، وهو في الآخرة من الخاسرين . "

অর্থ : আর ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় । যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করবে , পরকালে নিশ্চয় সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে । সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৮৫

ইসলাম শুধু মক্কা- মদীনা কিংবা আরবের জন্যই সীমাবদ্ধ নয়; বরং পৃথিবীর সকল বর্ণ , গোত্র , জাতি , ধনী- গরীব , সাদা- কালো ও আরব- অনারব সকল মানুষের জন্যই আল্লাহপ্রদত্ত একমাত্র সঠিক ধর্ম । ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম প্রথমে আল্লাহর প্রেরিত বিধান হিসেবে অবতীর্ণ হলেও ধর্মের লোকেরা তাতে নানাবিধ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে ফেলেছে । ফলে সেগুলো আল্লাহর মনোনিত ধর্ম হওয়ার অধিকার হারিয়েছে । কিন্তু ইসলামই এমন ধর্ম যাকে সকল প্রকার পরিবর্তন থেকে পরিপূর্ণরূপে সংরক্ষণের ওয়াদা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার ইরশাদ ,

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ـ سورة الحجر : ٩.

অর্থ , আমিই এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি , আর আমিই (তা কেয়ামত) অবধি সংরক্ষণ করবো।

বর্তমান পৃথিবীতে ইসলাম ছাড়াও আরো অনেক ধর্মই রয়েছে , ইহুদী , খৃস্টান , বৌদ্ধ , হিন্দু , শিখ ইত্যাদি। তম্মধ্যে খৃস্টান ধর্ম সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিবেচনায় পৃথিবীর সবচে' বড় ধর্ম হিসেবে বিবেচিত ।

খৃস্টানরা যুগ যুগ ধরে ধর্মের প্রচার , প্রসারের লক্ষ্যে অনেক ধরণের চেষ্টা চালিয়েছে। কখনো তারা বিভিন্ন জাতিকে বল প্রয়োগের মাধ্যমেও খৃস্টান বানিয়েছে । আর বলপ্রয়োগ করা সম্ভব না হলে সেখানে বিভিন্ন কলাকৌশলের মাধ্যমে টাকা-পয়সার লোভ দেখিয়ে মানুষকে ধর্মান্তরিত করেছে ।

বিশেষকরে বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকাগুলোতে এসব ঘটনা অহরহ ঘটে চলছে। আমরা মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো , জনসাধারণকে মিশনারীদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করা। এবং খৃস্টানদের ধর্ম সম্পর্কে ভালোভাবে অবগতি লাভ করে দাওয়াতের ময়দানে তাদেরকে জোয়াব দেওয়া ।

এ লক্ষ্যে খৃস্টান ধর্ম সম্পর্কে মৌলিক ধারণার জন্যে হযরত মাওলানা মুফতি সারওয়ার ফারুকী নদভী সাহেবের " عیسائی مذہب اور ان کے فرقوں کا تعارف " কিতাবটি সংক্ষিপ্ততার বিবেচনায় খুবই উপযোগী মনে হয়েছে। মুফতী মুহাম্মাদ সারওয়ার ফারুকী নদভী দা.বা. হিন্দুস্তানে দাওয়াতের ময়দানের এক শাহসোয়ার৷ তাঁর অনেকগুলো কিতাবই বাংলায় অনুবাদ হয়ে পাঠক মহলের মন জয় করেছে। যে অনুবাদের ধারা শুরু করেছেন বন্ধুবর মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান নদভী৷

সময়ের চাহিদায় বইটির বাংলা অনুবাদ করা প্রয়োজন ছিল। বাংলাভাষী দাঈগণ এর মাধ্যমে খৃস্টান ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলো জানতে পারবেন। এবং সুচারুরূপে দাওয়াতের কাজ আঞ্জাম দিতে পারবেন। মানুষকে গোমরাহী থেকে বাঁচিয়ে মুক্তির পথ দেখাতে পারবেন। আল্লাহ তায়ালা যেন আমার ক্ষুদ্র এই মেহনতকে কবুল করেন। এর মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের ফায়েদা পৌঁছান , সে কামনাই করি।

কিতাবটি লেখার পেছনে প্রিয় মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান নদভীর উৎসা ও প্রেরণাই মূলত আমাকে এগিয়ে দিয়েছে। অনুবাদের শুরু থেকে নিয়ে প্রকাশের হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত - সম্পাদনা , সেটিং ও বিভিন্ন তথ্য সংযোজন করা - মোটকথা তিনি এ কিতাবটির পেছনে অনেক সময় ব্যয় করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর ইলম ও আমলে বরকত দিন এবং তাঁকে একটি উজ্জল ভবিষ্যত দান করুন !

সবশেষে , পৃথিবীর কেউই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। সংশোধনের শত চেষ্টার পরও কোন ভুল পাঠক মহোদয়ের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবগতি করবেন , আশা করি। ইনশা আল্লাহ পরবর্তী এ্যাডিশনে তা বিশুদ্ধ করে নিব।

ক্ষুদ্র এ প্রয়াসকে আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করে নিন। আমীন !

মিজানুর রহমান কাসেমী নদভী
আল মাহাদুল আলী আল ইসলামী , হায়দারাবাদ , ইন্ডিয়া
৩০- ১১- ২০২১ ইং

লেখকের ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

বর্তমান পৃথিবীতে খৃস্টান ধর্ম অনুসারীদের সংখ্যা হিসেবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধর্ম হিসেবে বিবেচিত। "Colonialism" (উপনিবেশবাদ) এর মূলনীতি কারণেই আজ এশিয়া , আফ্রিকা এবং আমেরিকায় খৃস্টান ধর্ম ব্যাপক প্রচার- প্রসার লাভ করেছে। " Colonialism " এর অর্থ হচ্ছে , এক এলাকার মানুষ অন্য এলাকায় গিয়ে নিজস্ব বসতি স্থাপন করা এবং সে এলাকা দখল করে নেয়া । সাধারণত যে এলাকায় নতুন বসতি স্থাপন করা হয় সেখানের লোকজনকে নিজেদের আওতায় এনে তাদের উপর নিজস্ব কালচার , সংস্কৃতি , স্বভাব- চরিত্র ও ক্ষমতা চাপিয়ে দেয়া হয় ।

ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় , এক সময় অন্য গোত্রের উপর চড়াও হয়ে তাদেরকে দাস বানানোর প্রথা চালু ছিল৷ বর্তমানে নিয়মতান্ত্রিকভাবে অন্য দল বা গোষ্ঠীর উপর চড়াও হওয়ার ধারাবাহিকতা রোমীয় বাদশাহদের মাধ্যমেই হয়েছে। কেননা এ যুগে সর্ব প্রথম ইউরোপীয় খৃস্টানরাই আফ্রিকা ও আমেরিকার উপর নিজেদের শাসন ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছিল৷

নতুন নতুন এলাকা দখল করার এ পদ্ধতি ইউরোপিয়ানদের শুধু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতিই সাধন করেনি ; বরং এ বিষয়টি তাদের ধর্মের প্রচারেও অনেক ভূমিকা পালন করেছে। এর মাধ্যমে তাদের ধর্মের প্রচার- প্রসারও বহুগুণে বেড়েছে। তাদের এ মিশনে অনেক মিশনারীও থাকত, যারা ক্ষমতার ইশারায় দখলকৃত এলাকায় খুব ব্যাপকভাবে তাদের ধর্মের প্রচার করে বেড়াত৷

উপমহাদেশে খৃস্টান ধর্মের প্রচার ১৬০০ খৃস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের মাধ্যমে শুরু হয় । এরপর কালপরিক্রমায় তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হলে তখন খৃস্টধর্ম আরো বিস্তৃতি লাভ করে৷

১৮০০ শো শতাব্দীর শেষদিকে প্রোটেস্ট্যান্ট খৃস্টান বাহিনী দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস শুরু করে । এবং সেখানে তাদের ধর্মের প্রচার শুরু করে । এশিয়া ও আফ্রিকায় ধর্মের প্রচার, প্রসারের লক্ষ্যে তারা যেন ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে । সামাজসেবা , শিক্ষাসেবা , বয়ান - বক্তৃতা , তর্কবিতর্ক- মোনাযারা সহ সব রকমের চেষ্টা , প্রচেষ্টার মাধ্যমে ধর্মপ্রচার চালিয়ে যায় । এর ফলশ্রুতিতে বিশাল একটি দল তাদের খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে নেয় ।

এ যুগে খৃস্টান ধর্ম সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিবেচনায় বর্তমান বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম । তাই মুসলিম দাঈগণের জন্য উচিত হলো এ ধর্মের পরিচিতি ও আকীদা সম্পর্কে জ্ঞান রাখা। এতে খৃস্টানদের মাঝে দাওয়াতের কাজ সহজ হবে ইনশা আল্লাহ ।

এ বিষয়টি মাথায় রেখেই বক্ষমান বইয়ে খৃস্টান ধর্মের পরিচিতি পেশ করা হয়েছে। এতে তাদের আকীদা- বিশ্বাস , উপাসনা পদ্ধতি , সামাজিক জীবন- যাপন ব্যবস্থা , রসম- রেওয়াজ , ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ ও তাদের বিভিন্ন ফিরকার পরিচয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এগুলো জেনে ভিন্নধর্মীদের মাঝে দাওয়াতের পথকে সুগম দিন! গোটা মানবজাতিকে হেদায়েতের ছায়াতলে আশ্রয় দান করুন ! আমীন !

মুফতী সারওয়ার ফারুকী নদভী
দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা , লাখনৌ , ইন্ডিয়া
২ - ১ - ২০১৯ ইং

খৃস্টধর্ম

পৃথিবীতে খৃস্টান ধর্মের একটি বিশেষ অবস্থান রয়েছে । রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে খৃস্টধর্ম একটি প্রতিষ্ঠিত ধর্মা ইসলাম ধর্মের মত খৃস্টান ও ইহুদী মতবাদকেও ইব্রাহীমী ধর্মের একটি শাখা মনে করা হয়। খৃস্টান ধর্মের অনুসারীদের ঈসায়ী বা মাছীহীও বলা হয়ে থাকে। খৃস্টান পণ্ডিতদের ধারণা অনুযায়ী , এ ধর্মপ্রণেতা হলেন ' ইয়াসু' বা যীশু আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম। খৃস্টান ধর্মে হযরত ঈসা আ. ' র জন্ম , তাঁর জীবন যাপন , শিক্ষা , মৃত্যু , ত্রিত্ববাদ এবং হযরত ঈসা আ. ' র শূলীতে নিহত হয়ে তাঁর অনুসারীদের গোনাহের কাফফারা আদায়, এগুলোকে ধর্মের মৌলিক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়া আর এসব বিশ্বাসে বিশ্বাসীকেই কেবল ঈসায়ী বলা হয় ।

হযরত ঈসা আ. ' র পুরা নাম

ইবরানী ভাষায় হযরত ঈসা আ. ' র নাম ইয়াশু বা ইয়াসু' । আরবিতে ঈসা বলা হয় , কুরআনে কারীমে এ শব্দটা অনেকবার উল্লেখিত হয়েছে। এর অর্থ বরকতপূর্ণ , মুক্তিদাতা এ শব্দটিই ইউনানী ভাষায় jesus লেখা হয় ।বাংলাতে লেখা হয় , ' যিশু'। আর মাসীহ হলো হযরত ঈসা আ. ' র উপাধি সাধারণত এর অর্থ আসে , রোগমুক্ত করা , আরোগ্য প্রদান করা। মানে , কারো উপর হাত বুলিয়ে তার থেকে কুপ্রভাব দূর করে দেয়া।

এমনিভাবে তাকে ঈসা নাসেরীও ডাকা হতো ; কেননা তাঁর প্রতিপালন ফিলিস্তিনের শহর " নাসেরায় " হয়েছিল । তাঁর উপনাম ইবনে মারয়াম। কারণ , তিনি হযরত মারয়াম আ. ' র সন্তান ছিলেন। খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী , তাঁর আরেক নাম

ছিল " য়াম্মা নোওয়েল " , এর অর্থ আসে , খোদা আমাদের সাথে রয়েছেন। এই নামে বাইবেলে ভবিষ্যতবাণীও পাওয়া যায়।

ঈসা আ. ' র পূর্ববর্তী ইহুদীদের ইতিহাস

মূসা আ. ' র অনুসারী সম্প্রদায়কে ইহুদী বলা হয়। তাদের ধর্মকে ইহুদী ধর্ম বলে। ঈসা আ. ' র আগমনের পূর্বে ইহুদীরা হযরত মূসা আ. ' র ধর্মে নিজেদের পক্ষ থেকে অনেক পরিবর্তন- পরিবর্ধন ও বিকৃতি সাধন করে। তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির বিশ্বাস রাখত না। কেউ কেউ তো সন্ন্যাসী জীবনে বিশ্বাস করত। কেউ বা আবার বনী ইসরাইলের সঙ্গে সর্ম্পক রাখাকেই নাজাতের উসিলা মনে করত। তাদের যে সব পণ্ডিতরা হায়কাল বা ইবাদতখানায় ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করত , তারা ধর্মকে এক প্রকার ব্যবসা বানিয়ে ফেলেছিল। তাদের অবস্থা এমন ছিল , নিজেদের সিদ্ধান্তকে আসমানী কিতাব তাওরাতের উপরও প্রাধান্য দিত। তাওরাতের হুকুমকে বিকৃত করে জনসাধারণের কাছে পেশ করত৷

সুদ , লোভ , হিংসার মত বাজে অভ্যাস তাদের মাঝে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। তারা মনে করত , ধর্ম একটি বাহ্যিক এবাদত মাত্র , মানুষের সমাজ- জীবনের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই ।তারা আল্লাহর বিধি নিষেধকে রহিত করতে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখত। সমাজের এমন কঠিন এক সময়ে ইহুদীরা একজন মাসীহার আগমনের অপেক্ষা করছিল। যাঁর ব্যাপারে তাদের পবিত্র কিতাবসমূহে ভবিষ্যৎবাণীও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তারা এই বিষয়টি ভালোভাবে জানত না, সে মাসীহার জন্ম কখন হবে। সে মাসীহার অপেক্ষায় আজও ইয়াহুদীরা অপেক্ষয়মান।

হযরত ঈসা আ. ' র জন্ম

ইতিহাসবিদদের ভাষ্য মতে হযরত ঈসা আ. ফিলিস্তিনের উত্তরে অবস্থিত গ্যালিলি হ্রদের পাশে " তানাছুর " নামক এলাকায় বসবাস করতেন । তবে তাঁর জন্ম হয়েছিল ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী " বাইতে লাহম " শহরে৷

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম' র জন্মের ব্যাপারে ইতিহাসবিদদের মতানৈক্য রয়েছে। তবে এতটুকু জানা যায় , হযরত ঈসা আ. ' র জন্ম হয়েছে খৃস্টপূর্ব ৪র্থ থেকে ৭ম বছরের কোনো এক সময়ে । কুমারী হযরত মারয়াম এর গর্ভে জন্ম হওয়ার কারণেই তিনি খৃস্টানদের কাছে আল্লাহর ছেলে বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন৷ অনেক খৃস্টান তো স্বয়ং তাঁকেই খোদা মনে করে । মানুষের রূপ ধারণ করে তিনি দুনিয়াতে আগমন করেছেন । বাইবেলের ইঞ্জীল অংশে হযরত ঈসা আ. ' র জন্মের ব্যাপারে কিছুটা এমন বর্ণনা পাওয়া যায় , তাঁর মা মারয়াম আলাইহাস সাল্লামের বিবাহ ইউসুফ নামে প্রসিদ্ধ একজন ব্যক্তির সাথে হয়েছিল। তবে , তাদের বিবাহ ও মিলন হওয়ার পূর্বেই হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কুদরতে মারয়াম আ. ' র গর্ভে আসেন ।

শৈশব ও যৌবনকাল

হযরত ঈসা আ. ' র শৈশব ও যৌবন কাল সম্পর্কে ইঞ্জীলে উল্লেখযোগ্য কিছুই বর্ণিত হয়নি । তবে এতটুকু বলা যায় , হযরত ঈসা আ. তাঁর ধর্মীয় দীক্ষা পরিবার থেকেই অর্জন করেন । এছাড়া তিনি তাঁর পারিবারিক বুযুর্গ ব্যক্তিদের সাথে প্রতি শনিবারে (তথা পবিত্র দিন) ধর্মীয় মজলিসসমূহে নিয়মতান্ত্রিকভাবে উপস্থিত থাকতেন । এ ছিল তার শৈশব কালের কিঞ্চিৎ বর্ণনা।

যৌবনকাল

ঈসা আ.' র যৌবনকাল কীভাবে অতিবাহিত হয়েছে , এ ব্যাপারেও ইতিহাস থেকে কোন বিস্তর ও সঠিক কিছু জানা যায় না। ইতিহাস এ সম্পর্কে অনেকটাই নিশ্চুপ। হযরত ঈসা আ. এর যুগকে lost year's of Jesus বলা হয়ে থাকে । তৎকালীন খৃস্টান ইতিহাসবিদ ও বিশ্লেষকগণ এসব বিষয়ে শুধু নিজেদের কল্পনাপ্রসূত কিছু গবেষণা পেশ করেছেন। তবে , তারা বর্তমান খৃস্টান পণ্ডিতদের বিপরীত ধর্মীয় শিক্ষা- দীক্ষা ও আকীদা- বিশ্বাসকে খুবই সাধারণভঙ্গিতে বর্ণনা করতেন।

ঈসা আ. ইহুদী জাতি কর্তৃক বাইতুল মুকাদ্দাসে সংঘটিত বিভিন্ন অপকর্মের কারণে অনেক চিন্তিত ও বিচলিত ছিলেন। তারা সর্বদা ঈসা আ. ' র বিরুদ্ধে কুৎসা রটাত। ঈসা আ. পাদ্রিদের উপদেশ দিয়ে বলতেন , তোমরা আল্লাহ তায়ালার বিধান ছেড়ে মানুষের

মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করছ। আল্লাহ তাআলার হুকুম অমান্য করে নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করছ ।

ওহীর অবতরণ

৩০ বছর বয়সে হযরত ঈসা আ. ' র উপর ওহী অবতরণ শুরু হয়। তখন থেকেই তাঁর নবুওয়াতের যুগ আরম্ভ হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁকে কিছু মুজেযা দিয়েছিলেন। তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো, মুমূর্ষ ব্যক্তিকে সুস্থ করার ক্ষমতা। আর এ জন্যই তাকে মাসীহ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

ধর্মের প্রচার

আল্লাহ তাআলার হুকুম আসার পরেই হযরত ঈসা আ. তাঁর ধর্মের প্রচার শুরু করেন। ঈসা আ. ' র ধর্ম প্রকৃতপক্ষে কোন নতুন ধর্ম ছিল না ; বরং যেনো হযরত মূসা আ. ' র ধর্মের

একটি সহজ রূপ ছিল। যা ইহুদী পণ্ডিতরা বিকৃত ও পরিবর্তন করে ফেলেছিল। হযরত ঈসা আ. তাদের এসব অন্যায় কাজে বাধা দেন। ফলে তাঁকে ইহুদী পণ্ডিতদের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। বাধ্য হয়ে তিনি " গ্যালিলি " ঝিলের পাশে অবস্থিত " ক্যাপারনাউম " এলাকায় হিজরত করেন। এলাকার অধিকাংশ মানুষ তাঁকে " প্রতিশ্রুত মাসীহা " মেনে নিয়ে তাঁর উপর ঈমান আনে। সেখানে তিনি একটি বড় সমাবেশে ভাষণ রাখেন এবং মানুষের সামনে তাঁর শিক্ষা- দীক্ষা উপস্থাপন করেন । পরবর্তীতে এ ভাষণ " পাহাড়ি ভাষণ " নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। তাদের কাছে এ ভাষণটি অনেক মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। যেমন মুসলিম উম্মাহর কাছে বিদায় হজ্বে নবীজির ভাষণ অত্যন্ত মূল্যবান।

হযরত ঈসা আ. ' র খুতবা

জনসমাবেশে ঈসা আ. ' র ভাষণ ছিল এ রকম:

" সুসংবাদ তাদের জন্য যারা বাহ্যত গরীব , কেননা আসমানের বাদশাহী তো তাদেরই জন্য।

সুসংবাদ তাদের জন্য যারা চিন্তাগ্রস্ত কেননা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের শান্তনা মিলবে ।

সুসংবাদ তাদের জন্য যারা সভ্য , ভদ্র কেননা তাদের জন্যই পৃথিবীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

সুসংবাদ তাদের জন্য যারা দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত , কেননা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে স্বচ্ছলতা ও পরিতৃপ্তি দান করবেন।

সুসংবাদ তাদের জন্য যারা লোকদের মাঝে ঝগড়া- বিবাদ হলে সমাধান করে দেন , কেননা তাদেরকে তো আল্লাহ তাআলার কুদরতী ছেলে বলা হবে ।

হে মুমিনগণ শোনো ! আমার অনুসরণ করার কারণে মানুষ তোমাদের উপর অত্যাচার , নির্যাতন করবে , তোমাদের উপর

উপহাস ও ঠাট্টা- বিদ্রুপ করবে , এবং তোমাদের উপর বিভিন্ন মিথ্যে অপবাদ দিবে, এসব দেখে তোমরা নিজেদেরকে সুসংবাদের উপযুক্ত মনে করবে এবং খুশী ও আনন্দিত হবে। কেননা এসব সহ্য করার কারণে তোমাদেরকে জান্নাতে অনেক বড় পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হবে । আর এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কারণ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের সাথেও - যারা নবিগণের অনুসরণ করেছেন - এরূপ আচরণ করা হয়েছে ।

হযরত ঈসা আ. ' র শিক্ষা

ধারাবাহিক দাওয়াতের ফলে বারোজন লোক হযরত ঈসা আ. ' র অনুসারী হন। তাঁদেরকে ইতিহাসের পাতায় " হাওয়ারী " বলা হয়। কুরআনে কারীমেও " হাওয়ারী " উল্লেখ হয়েছে। হযরত ঈসা আ. তাঁর শিক্ষায় এ বিষয়টির প্রতি অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন , যেন ইহুদীরা তাদের বদঅভ্যাসগুলো ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় ফিরে আসে। তাঁর শিক্ষার মৌলিক বিষয় ছিল, ভ্রাতৃত্ববোধ ও পরস্পর সম্প্রীতি , ভালোবাসা । সূদ , ঘুষ , মদ, ব্যাভিচার , অন্যের উপর জুলুম ও অন্যান্য হারাম কাজসমূহ থেকে তিনি ইহুদীদের বারণ করতেন । তিনি আল্লাহর নিয়ম- কানুন প্রতিষ্ঠিত হবার ভবিষ্যৎবাণী করেন। এতে ইহুদী পণ্ডিতরা ভয় পেয়ে যায়। এবং তারা হযরত ঈসা আ. ' র ধর্মের বিরোধিতা শুরু করে ।

হযরত ঈসা আ. ' র উপর অপবাদ আরোপ

ইঞ্জীলের ভাষ্য অনুযায়ী হযরত ঈসা আ. ' র উপর দুটি মারাত্মক অপবাদ আরোপ করা হয়েছে,

১. তিনি জেরুজালেম ধ্বংসের জন্য বদদুআ করেছেন।

২. তিনি হযরত দাউদ আ. ' র সিংহাসনের উত্তরাধিকারী প্রতিশ্রুত মাসীহ বলে নিজেকে দাবি করেছেন।

(স্পষ্টত , এগুলো অবাস্তব এবং ডাহা মিথ্যা অপবাদ। কারণ , আল্লাহর প্রেরিত সকল নবী , রাসূলগণই নিষ্পাপ ও ত্রুটিমুক্ত ; তারা কখনোই কোন অন্যায় কথাবার্তা বলতে পারেন না।)

শূলীতে চড়ানোর বিশ্বাস

একবার হযরত ঈসা আ. তাঁর সাথীদের সাথে জেরুজালেম আগমন করেন। তখন ওখানকার ইহুদীরা তাঁকে গ্রেফতার করে নেয় । তাঁকে গণকদের সরদারের সামনে মোনাযারার জন্য উপস্থিত করে। ওখানে অবস্থানরত ইহুদী পণ্ডিতরা তাঁর কথাগুলোকে কুফুর বলে সাব্যস্ত করে এবং তাঁকে ওয়াজিবুল কাতল অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুদণ্ড অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করে । খৃস্টানদের ধারণা , ওই সময় ইহুদীদের নিয়ম অনুযায়ী ইহুদীরা তাঁকে ক্রুশের উপর ঝুলিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে ।

হযরত ঈসা আ. ' র দ্বিতীয়বার জন্মলাভ করার আকীদা

খৃস্টানদের বিশ্বাস , হযরত ঈসা আ. কে শূলিতে চড়ানোর তিন দিন পর তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। খৃস্টানরা মনে করে, হযরত ঈসা আ. এ ত্যাগ দিয়েছেন তাঁর উম্মত ও পূর্ববর্তী সকল মানুষকে তাদের সকল গোনাহ থেকে পবিত্র করানোর জন্যে। যে গোনাহসমূহের শুরুটা হযরত আদম ও তাঁর বিবি হাওয়া থেকে সংঘটিত হয়েছে । এবং প্রত্যক মানুষ যে গোনাহের বোঝা নিয়ে জন্ম লাভ করে। আর এজন্যই হযরত ঈসা আ. কে মুক্তিদাতা বলেও সম্বোধন করা হয় ।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ

উপরোল্লেখিত বিষয়ে মুসলমানদের বিশ্বাস হলো আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ. ' র তাওবা কবুল করেছেন। ফলে হযরত আদম আ. সে অপরাধ থেকে চির মুক্তি লাভ করেছেন। হযরত ঈসা আ. ' র ব্যাপারে ইসলামের আকীদা হলো , শূলিত চড়ানোর আগেই আল্লাহ তাআলা তাঁকে আসমানে উঠিয়ে

নিয়েছিলেন। এবং ঈসা আ. ' র পরিবর্তে যে ব্যক্তি তাঁর খোঁজ ইহুদীদের দিয়েছিল তাকে হত্যা করা হয় । ঘটনা হলো, ইহুদীরা হযরত ঈসাকে হত্যার পরিকল্পনা করলে আল্লাহ তাআলার কুদরতে এ লোকটাকে ইহুদীরা হযরত ঈসা মনে করে বসে। এবং তাকেই শূলিতে চড়িয়ে দেয়। কারণ , তার আকৃতি ছিল হযরত ঈসার মত দেখতে।

আর পূর্ববর্তীদের গোনাহের প্রায়শ্চিত্ত হওয়ার বিষয়ে এটা সুস্পষ্ট ও চিরসত্য যে , আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ. ও তাঁর বিবি হাওয়া আ. থেকে সংঘটিত অপরাধ ক্ষমা করে তাওবা কবুল করে নিয়েছেন। তো তাওবা কবুল হওয়ার পরও প্রত্যেক মানুষকে এ গোনাহের বোঝা নিয়ে জন্ম লাভের বিষয়টি খুবই মূর্খতাসূলভ কথা।

খৃস্টানদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ

ঈসায়ী ধর্মের প্রথম যুগে যে সমস্ত লোকদেরকে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব মনে করা হত তারা হলেন ,

১. পাতরাস : হযরত ঈসা আ. ' র ছাত্রদের মধ্যে পাতরাস অন্যতম। তিনি ছিলেন একজন ফিলিস্তিনী ইহুদী। তাঁর আসল নাম ছিল শামউন। কিন্তু হযরত ঈসা আ. তাঁকে ভালোবেসে সীপাস বলে ডাকতেন । সীপাসের অর্থ অভিধানে পাওয়া যায়, মজবুত ও শক্ত পাথর । তাঁর সম্পর্কে খৃস্টানদের ধারণা, তিনি একজন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন ।তাঁর কারণেই অনেক লোক খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। খৃস্টানদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ইঞ্জীল শরীফের একটি নোসখা যা " ইঞ্জীলে মারকাস " নামে পরিচিত , এর প্রণেতা মার্কাস তাঁরই শিষ্য ছিলেন । সে মূলত পাতরাস থেকেই ইঞ্জীলের বর্ণনা শুনে ঐতিহাসিক " ইঞ্জীলে মারকাস " রচনা করেছেন বলে ধারণা করা হয় ।

২. শৌল পল। তিনি মূলত তারতুস এলাকার একজন ইহুদী ছিলেন । তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের পবিত্র গ্রন্থগুলো গভীরভাবে পড়েন। হযরত ঈসা আ. এর যুগে জীবিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর সাথে সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ হয়নি । শুরুতে তিনি হযরত ঈসা আ. এর বিরোধিতা করতেন , এবং অনেক খৃস্টানদের তিনি হত্যাও করেছেন। পরবর্তিতে তিনি ঈসা আ. ' র ধর্ম কবুল করে ঈসায়ী হয়ে যান। এবং খৃস্টান ধর্মের বড় দাঈ হয়ে যান । তিনি ঈসায়ী শিক্ষা- দীক্ষার মাধ্যমে পুরা ইউরোপকে আলোকিত করেছিলেন ।

৩. ইউসুফ বারনাবাস। তিনি হযরত ঈসা আ. ' র বিশেষ অনুসারীদের একজন । ' ইঞ্জীলে লূকা ' ' র বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর আসল নাম ছিল ইউসুফ । বরনাবাস তাঁর উপাধি । এ উপাধি তাঁকে হাওয়ারী সাথীরা দিয়েছিল তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও একনিষ্ঠতার কারণে।[১]

বারনাবাস ' র অর্থ , উপদেশের ছেলে। তিনি খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করলে হযরত ঈসা আ. তাঁর ব্যাপারে সবাইকে জানান। ইউসুফ শৌল পলের সাথে বিভিন্ন দ্বীনী সফরে বের হতেন। ইঞ্জীলের একটি নুসখা তাঁর দিকেও নিসবত করা হয়। যেটাকে " ইঞ্জীলে বারনাবাস " বলা হয় ।

তবে বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী , ইউসুফ ও পলের মধ্যকার কিছু মতবিরোধ তৈরি হয়। ফলে ইউসুফ পৃথক হয়ে যান। এ মতপার্থক্য সম্পর্কে বাইবেলের বর্ণনা হলো , বারনাবাস ইউহান্নাকে সফরসঙ্গী বানাতে চাইলেন আর পল সীলাসকে । মতপার্থক্যের এ কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ বাইবেলের "

---

[১] (লুকা, আমাল, ৪: ৬৩: ৭৩)

কিতাবুল আমাল " ' র ৫১ - ৫৩, ১৪ নং আয়াতে পাওয়া যায়।

খৃস্টান ও অন্যান্য ধর্ম

জেরুজালেমের অধিকাংশ মানুষ ইহুদী ছিল। তারা পরবর্তীতে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হয়। আনতাকিয়াতে কিছু লোক মূর্তিপূজারি ছিল আর কিছু ছিল অগ্নিপূজারি। যারা মূর্তিপূজারি ছিল বাইবেলে তাদেরকে খৃস্টান ধর্মের লোক বলা হয়েছে৷ আর অগ্নিপূজারিদেরকে অন্যজাতি বলা হয়েছে।

ইহুদী মাসীহীরা খৎনা করা এবং ইহুদী ধর্মের সমস্ত রীতিনীতি মেনে চলা অত্যন্ত জরুরী মনে করত। এজন্য তাদেরকে 'মাখতূন' বলা হত। তবে , অগ্নিপূজারিরা খৎনা করাকে আবশ্যক মনে করত না। তাই তাদেরকে " গাইরে মাখতূন " বলা হত।

বাইবেলের এসব বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় , তাদের মাঝে দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধ ছিল। খৃস্টানদের বিবরণ অনুযায়ী বারনাবাস শৌলপল থেকে পৃথক হয়ে যাবার পর তাঁর এলাকা ক্যাপরাসে চলে যান এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু ও দাফনের কাজ সম্পাদন করা হয়।

৪৭৮ ঈসায়ীতে বারনাবাসের কবর থেকে তাঁর লিখিত ইঞ্জীলের খোঁজ পাওয়া যায়। এরপর ৪৯৬ ঈ. পর্যন্ত বিভিন্ন গির্জায় এ কিতাব পড়া হত। কিন্তু এরপর কিছু কিছু খৃস্টান পণ্ডিত বারনাবাসের ইঞ্জীল পড়তে নিষেধ করে। তখন সেটি পোপ স্যাকসটোসের (১৫৯০- ১৫২১) লাইব্রেরীতে রেখে দেওয়া হয়৷ এভাবে এক হাজার বছর তা লাইব্রেরীর শোভা হিসেবেই সাজিয়ে রাখা হয়। এরপর পাদ্রি ফ্রামারিনো ১৫৮৫- সনে এটি

সংগ্রহ করেন। তখন থেকেই এটি ব্যাপকভাবে মানুষের হাতে হাতে চলে আসে৷

খৃস্টধর্ম প্রচার

বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী , ইহুদীদেরকে সত্যের পথে আহ্বান করতে হযরত ঈসা আ. তাঁর হাওয়ারীদের বিভিন্ন পাহাড়ের চূড়ায় পাঠাতেন। অনেক ইতিহাসবিদগণ এটাও বলেছেন, তিনি ভারতের কাশ্মীর ও তিব্বত এলাকাতেও এসেছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে পবিত্র গ্রন্থসমূহে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। হযরত ঈসা আ. ' র পরে তাঁর সাথীগণ এ দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখেন। এবং বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে মানুষকে আল্লাহ তাআলার দ্বীনের পথে ডাকতে থাকেন ।

হযরত ঈসা আ. ' র পরবর্তী সময়

হযরত ঈসা আ. ' র পর তাঁর অনুসারীদের মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির মতবিরোধ তৈরি হয় । খৃস্টানধর্মালম্বীরা তা মানতে গিয়ে দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে :

১- তাদের মধ্যে একদল বলতে থাকে , হযরত ঈসা আ. ' র শিক্ষা- দীক্ষার মাঝে কোন রকমের পরিবর্তন আনা যাবে না। বরং সেগুলোকে আপন অবস্থায়ই রাখতে হবে। কোন প্রকার ব্যাখ্যা – বিকৃতি করা যাবে না ।

২- আরেক দল বলে , হযরত ঈসা আ. ' র ধর্মের প্রচার-প্রসারের জন্য তাঁর শিক্ষা- দীক্ষার মাঝে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা এবং তাতে কোন ব্যাখ্যা বৃদ্ধিও করা যাবে ।

প্রথম দলের মূল প্রবক্তা ছিলেন ইউসুফ বার্নাবাস। আর দ্বিতীয় গ্রুপের মূল ছিলেন সাউল পল । এ কারণেই মূলত তাদের মাঝে মতপার্থক্য তৈরি হয়। ইউসুফ বার্নাবাসের জীবনী থেকে বুঝা যায়, তিনি সাউল পল থেকে পৃথক হবার পরও

একনিষ্ঠতার সহিত ঈসা আ. ' র দ্বীন- প্রচারের কাজ চালিয়ে গিয়েছেন। ইতিহাস ঘাটলে তাঁর অনেক অনুসারীও পাওয়া যাবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো , খৃস্টানদের প্রথম দিকের ইতিহাসে পল ও বার্নাবাস উভয়ের অনুসারীদের বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু যখন থেকে পলের অনুসারীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হয় তখন থেকে ইতিহাসের পাতায় বার্নাবাসের অনুসারীদের কথা খুঁজে পাওয়া যায় না। যেনো তাঁরা মৃত্যুর পর শত শত বছর ইতিহাসের পাতায় জেগে থেকেও হঠাৎ- ই উদাও হয়ে গিয়েছেন !

খৃস্টানদের উপর জুলুম- নির্যাতন

চতুর্থ শতাব্দীর শুরু অবধি ঈসায়ী সম্প্রদায়কে বিভিন্ন কঠিন অবস্থার মোকাবেলা করতে হয়েছে। এর বড় কারণ হলো , তাদের উপর রোমদের কর্তৃত্ব ছিল। রোমানরা তাদের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করত , যেমন ইহুদীরা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করত। ওই সময় খৃস্টান ধর্ম নিয়মতান্ত্রিকভাবে গোছালো ছিল না। খৃস্টানদের সংখ্যাও খুল অল্পই ছিল। তা সত্ত্বেও অত্যন্ত কষ্ট - সাধনার মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকাতে তারা নিজেদের আস্তানা গড়ে তোলে। এভাবে সময়ের সাথে সাথে খৃস্টধর্ম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। কখনো তাদের উপর রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জুলুম- নির্যাতন চালানো হত। ইসরাঈলী তথা ইহুদীরা তাদেরকে নির্যাতন করত। আবার কখনো তাদেরকে আপন গতিতে ছেড়ে দেয়া হত। নির্যাতনের কারণে দুর্বল ঈমানের লোকেরা খৃস্টান ধর্ম পরিত্যাগ করত। আবার যখন অবস্থা ভালো হত তখন আপন ধর্মে ফিরে আসত। তাদেরকে কবুল করা হবে কিনা, তাদের তাওবা গ্রহণীয় হবে কিনা? এটাই তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয় হয়ে দাঁড়াত।

নতুন যুগে খৃস্টান ধর্মের প্রচার- প্রসার

এ যুগে খৃস্টান ধর্মের ব্যাপক প্রচার- প্রসারের কারণ হলো , "কলোনেলিজম " বা খৃস্টানদের উপনিবেশবাদের উত্থান । অর্থাৎ নতুন জীবন- ব্যবস্থা ও নিয়ম- নীতি । এর অর্থ হচ্ছে, কোন এলাকার লোকজন এক এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় গিয়ে বসবাস শুরু করা এবং সেখানে নিজেদের কব্জা প্রতিষ্ঠা করা। সাধারণত কোথাও নতুন আবাদি শুরু করা হলে সেখানকার লোকদেরকে নিজেদের কন্ট্রোলে এনে তাদের উপর শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং নিজেদের হুকুম চাপিয়ে দেয়াকে বুঝায়৷ ইতিহাসে এর অনেক দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় । কিন্তু প্লান করে কোন এক জাতির উপর অন্য জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সূচনা করে চৌদ্দশত শতাব্দীতে রোমের বাদশাহরা৷ এ নীতি ফলো করেই ইউরোপে বসবাসরত খৃস্টানরা নিজেদের আবাদি বাড়িয়ে ধীরে ধীরে আফ্রিকা, আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন এলাকায় বাসস্থান বানিয়ে নিয়েছে।

এই নিয়ম তাদের শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপকারই করেনি; বরং তাদের ধর্মের ব্যাপক প্রচার- প্রসারও করেছে। নতুন নতুন বস্তি গঠন করে গোত্রের পণ্ডিতরা দখলকৃত এলাকায় ব্যাপকভাবে নিজেদের ধর্মের প্রচার- প্রসার করে বেড়াত । ইন্ডিয়াতে ষোলশো শতাব্দী থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমনের মাধ্যমে খৃস্টধর্মের প্রচার- প্রসার শুরু হয়। এরপর উপমহাদেশের ক্ষমতা দখল করে তারা পাদ্রিদেরকে বিভিন্ন সরকারী পর্যায়ের প্রধান নিযুক্ত করত । এবং তাদের মাধ্যমে নিজেদের ধর্ম প্রচার করত।

ধর্ম প্রচারক ও ধার্মিকদের ব্যাপারে খৃস্টানদের ধারণা

ধর্ম প্রচারকদের ব্যাপারে তাদের ধারণা ছিল , একজন ধর্ম প্রচারক তিনি সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার মধ্যকার সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম হন । বাস্তবিকপক্ষে যদিও তারা মানুষ হয়ে থাকেন; আল্লাহ তাআলা তাদেরকেও সে বস্তু দিয়েই সৃষ্টি করেছেন যেগুলো দিয়ে অন্যান্য মানুষ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা মূলত সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে সুসম্পর্কের মাধ্যম হয়ে থাকেন। এ বিশ্বাস খৃস্টানদের বড় গোমরাহী ও ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত করেছে৷ ফলে তারা পোপদেরকে এত অধিকার দিয়েছে যা তাদের ক্ষমতাবান বাদশাহকেও দেয়া হয়নি। মোটকথা পোপদেরকে তারা ধর্মীয় নিয়ম- নীতি নির্ধারক বলে মনে করে।

তাদের ধারণা হলো, হযরত ঈসা আ. পাতরাসকে নিজের জানেশীন ও উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন, যাতে পাতরাস হাওয়ারীদের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা পান। তাদের দেখাশোনা ও খোঁজ- খবর নেন। পাতরাস রোমে যাওয়ার পর একটি ঘর বানান৷ এবং বাবা গোয়াকে রোমের সমস্ত গির্জায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন। আর এভাবেই গোয়া বাবা হযরত ঈসা আ. 'র খলীফা হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।

খৃস্টধর্মের পণ্ডিতরা নিজেদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী ধর্মীয় অনুশাসন পালন করতে করতে এতটাই নিম্ন স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল যে , তারা গোনাহ মাফ করার জন্যও চেক বানিয়ে বিক্রি করত । নিজেদের নিকৃষ্ট মনোবৃত্তির ফলে বাদশাহগণ ও ক্ষমতাবান লোকেরা জনগণকে বুঝাতে লাগল , গির্জার পাদ্রিগণই কেবল পবিত্র গ্রন্থের মর্ম বুঝতে পারেন। এবং পাদ্রিগণই পবিত্র গ্রন্থের অভিভাবক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী । এভাবে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা

পেয়ে পাদ্রিরা নিজেদেরকে পৃথিবীর বুকে ইশ্বরের উত্তরসূরি মনে করতে লাগল ।

তারা জনগণকে বুঝাল , গির্জা থেকে যে কথা বলা হবে এর বিরোধিতা করা যাবে না। এর বিরুদ্ধে কোন রকমের প্রশ্ন করা যাবে না। পাদ্রিরা যা বলবে তাই সত্য ও সঠিক। এবং তা মেনে নেয়া আবশ্যক। চাই তা বিবেকে ধরুক বা না ধরুক। মোটকথা , চাই তা বুঝে আসুক বা বুঝে না আসুক বিনাবাক্যে মেনে নিতে হবে।

প্রতিটি সাধারণ মানুষের উপর পাদ্রিদের কথা মান্য করা আবশ্যক। যদি তাদের কথা কারো বুঝে না ধরে তাহলে মনে করতে হবে , তার নিজেরই মধ্যে সমস্যা আছে। এখানে গির্জা বা পোপের কোন ভুল নেই। তাদের ভুল হতে পারে না। কোন কথা মনোপুত না হলে বুঝতে হবে, নিজের বিবেকেই সমস্যা; কারণ গির্জা ও পোপের কথা তার বুঝে আসছে না !

খৃস্টানরা গির্জা ও বাবার ব্যাপারে " ইস্তেহালা " ' র আক্বীদা রাখত। এর মানে, পোপ ও গির্জার ভুল হওয়া সম্ভবই না। খৃস্টানদের বিশ্বাস , ইশ্বরের পক্ষ থেকে দাওয়াতের দিন তারা যে রুটি ও মদ পান করে , সে রুটি হযরত ঈসা আ. ' র গোশতে আর মদ হযরত ঈসা আ. ' র রক্তে পরিণত হয়ে যায়। সেদিন যে ব্যক্তি রুটি ও গোশত খায় হযরত ঈসা আ. তার ভেতরে ঢুকে পড়ে। এবং তার রুহ ও শিক্ষার মাঝে একাকার হয়ে যায় ।[২]

[২] (ইঞ্জীলে মাত্তা, লুকা ও মার্ক)

পাপমোচন

পোপের কোনো গির্জা বানানো কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠান তৈরির প্রয়োজন হলে টাকা- পয়সার জন্যে তিনি ক্ষমার চেক লিখেন। এবং তার অনুসারীদেরকে এগুলো বিক্রি করে টাকা আনতে বলেন৷ তখন তারা এ চেকগুলোকে কম্পানির শেয়ার বিক্রির মত শেয়ার বাজারে বিক্রি করে। চেকের মাঝে নাম লেখার যায়গা খালি থাকে, যেখানে গুনাহ্ ক্ষমাপ্রার্থীর নাম লেখা হয়৷ এরচে' মজার বিষয় হলো , তাদের ধারণা , এই চেক কিনলে আগের এবং পরের সব গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়। যেনো চেকের বিনিময়ে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ যেনো তাদের জান্নাতের গ্যারান্টিময় টিকেট।

খৃস্টধর্মের পণ্ডিত ও প্রচারকগণ সব সময় গির্জায় থাকেন। এবং তাদের জীবন গির্জার জনয্ই ওয়াকফ করে দেন। গির্জার দেখাশোনা ছাড়া তাদের অন্য কোন দায়িতব্ই দেয়া হয় না। খৃস্টানদের পোপকে ধর্মগুরু বা যাজক বলা হয়। আর সবচে' বড় পোপকে বিশপ বা মেট্রোপলিটন , এবং আরবিতে আসকাফ বা মাতরান বলা হয়। এরপর সর্বোচ্চ পর্যায় হলো বেতরিকের৷ " বেতরিক " মূলত বিভিন্ন শহরের পোপদের হেড হয়ে থাকেন৷ এবং তাকে " কার্ডিনাল " ও বলা হয়। ১১ শতাব্দীর পূর্বে রোমের গির্জাসমূহের পোপদের " বাবা " উপাধি দেয়া হত। এখন তাদের ক্ষমতা আরো বেড়েছে। এখন পৃথিবীর সকল গির্জার প্রধান তারাই হয়ে থাকে। নিজেদেরকে তারা খৃস্টানদের প্রধান নেতা ও বাদশাহ বলে মনে করে। বরং তাদের মর্যাদা ও ক্ষমতা রাজা , বাদশাহদের চেয়েও বেশি। বাবাদের একক ক্ষমতা হয়ে থাকে। কারণ , তারাই নিয়ম-কানুন প্রণেতা। আবার তা বাস্তবায়ন করার ক্ষমতাও তাদের হাতেই। পবিত্র গ্রন্থ ইঞ্জীলের ব্যাখ্যা এরাই করে। খৃস্টানরা

বাবাদেরকে রহমতের খাজানা ও আসমানের দরজাসমূহের মালিক মনে করে। বাবারা এক সময় গির্জায় টেক্স দেয়া আবশ্যক করে দেয়। এজন্য গির্জাগুলোতে কোন রকমের অভাব ছিল না। ধন, সম্পদে গির্জাগুলো ভরপূর ছিল। সম্পদের আধিক্যের ফলশ্রুতিতে বিশ্বব্যাপী গির্জাগুলোতে এক সময় চরম বিভেদ দেখা দেয়। যার ফলস্বরূপ গির্জাকে কেন্দ্র করে খৃস্টানরা দুইটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে :

১. প্রোটেস্টেন্ট

২. ক্যাথোলিক

* * *

খৃস্টান ধর্মের আকীদাসমূহ

খৃস্টান ধর্মের মৌলিক আকীদাসমূহ হলো :

১. সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কীয় ধ্যান- ধারণা : খৃস্টানরা ইব্রাহীমী ধর্মের মত সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও তাঁর বিদ্যমানতার আকীদায় বিশ্বাসী। তারা আল্লাহ তাআলার সমস্ত গুণাবলীর উপর বিশ্বাস রাখে। এবং তা স্বীকারও করে। মোটকথা খৃস্টান ধর্মে আস্তিকতার স্থান রয়েছে। কিন্তু তদুপরি সৃষ্টিকর্তার আকীদায় ত্রিত্ববাদ তথা তিন সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করার কারণে এরাও মুশরিক ও কাফেরদের দলভুক্ত।

২.Trinity (তথা, ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস) : আরবীতে এটাকে ' আকীদাতুছ তাছলীছ ' বলা হয়। এ ব্যাপারে খৃস্টানদের প্রসিদ্ধ মতাদর্শ হলো , সহজে এভাবে বলা যায় , একের ভেতর তিন , আর তিনের ভেতর এক। অর্থাৎ , তারা বিশ্বাস করে , খোদা তিনটি বস্তুর সম্মিলিত একটি অস্তিত্বের নাম- পিতা , পুত্র এবং রূহুল কুদস। তবে , এ আকীদার ব্যাখ্যায় স্বয়ং খৃস্টান গবেষকদের মাঝে বিভিন্ন মতবিরোধ দেখা যায়। খৃস্টধর্মের একজন নিরপেক্ষ পাঠক হিসেবে আমি এ আকীদার বোধগম্যময় কোন ব্যাখ্যা পাইনি।

অধিকাংশ খৃস্টানদের বিশ্বাস , পিতা , পুত্র এবং রূহুল কুদস এর সমষ্টির নাম হলো " ইশ্বর " বা সৃষ্টিকর্তা। পিতা বলতে খোদার এক সত্তা উদ্যেশ্য। পুত্র বলতে খোদার সিফাতে কালাম যা দুনিয়াতে শারীরিক আকৃতিতে এসেছে , এবং আল্লাহর কালাম হয়ে সকল মানবজাতির মুক্তির উসিলা হিসেবে

আবর্তিত হয়েছে । আর " রুহুল কুদস " দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পিতা ও ছেলের মাঝে ভালোবাসার গুণাবলী।

অন্য মত অনুযায়ী, ত্রিত্ববাদের তৃতীয় বস্তুটা হলো, হযরত মারয়াম আ.।

মোটকথা, খৃস্টানদের ত্রিত্ববাদের মূল হলো, পিতা এক খোদা, ছেলেও খোদা , আবার রুহুল কুদসও এক খোদা ; কিন্তু তারা পৃথক তিন খোদা নয় , বরং তিনজন মিলে একটি খোদারই অস্তিত্ব। খৃস্টানরা হযরত ঈসা আ. কে সৃষ্টিকর্তার মানবিক রূপ মনে করে এবং তাকে খোদার একটি অংশ বলে সাব্যস্ত করে থাকে ।

ফাঁসি

খৃস্টানদের বিশ্বাস হলো , হযরত ঈসা আ. কে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে এবং তিনি মৃত্যুবরণও করেছেন। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে , খৃস্টানরা বিশ্বাস করে , এ ফাঁসি খোদাকে দেয়া হয়নি বরং খোদার মানবিক রূপ ঈসাকে দেয়া হয়েছে ।

৩. নবুওয়াত ও রিসালাতের আকীদা : নুবওয়াত ও রিসালাতের উপর বিশ্বাস রাখা এটাও তাদের এক গুরুত্বপূর্ণ আকীদা । তারা বিশ্বাস করে, যার উপর আল্লাহ তাআলার অহী নাযিল হয়, এবং যাকে মানবজাতির হেদায়াতের জন্য পাঠানো হয়, তাকে নবী বলে।

নবুওয়াত সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর বান্দাদের মাঝে সুপারিশের এমন নেযামকে বলে যা নবীগনের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে। যে নেযামের অধীনে মানবজাতির হেদায়াতের জন্য সৃষ্টিকর্তা সময়ে সময়ে নবী, রাসূল প্রেরণ করেছেন । যারা মানবীয় সকল গুণাবলীর দিক থেকে অন্যান্য মানব থেকে ভিন্ন।

আকীদায়ে রিসালাতের অধীনে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ আকীদা হলো, হযরত ঈসা আ. এর রাসূল বা দূতগণের উপর বিশ্বাস

পোষণ করা। এখানে রাসূল মানে পারিভাষিক নবী , রাসূল অর্থে নয়; বরং হযরত ঈসা আ.' র সাথীবর্গ উদ্দেশ্য । যাদেরকে হযরত ঈসা আ. বিভিন্ন এলাকায় দাওয়াতের কাজে পাঠিয়েছিলেন । পরিভাষায় তাদেরকে " হাওয়ারী " বলা হয়।

৪. আখেরাত । মুসলিমদের ন্যায় খৃস্টানদেরও বিশ্বাস , মৃত্যুর পর জীবিত হয়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত হতে হবে। নিজের কৃতকর্মের হিসেব দিতে হবে। ফলশ্রুতিতে কেউ হবে জান্নাতী, কেউ হবে জাহান্নামী। এ জীবনকেই আখেরাতের জীবন বলা হয়। এবং এর উপর ঈমান আনাকেই " ঈমান বিল আখেরাত" বলে ।

৫. পুনরুজ্জীবন তথা পুনরায় জীবিত হবার আকীদাহ। এটাকে "আকীদায়ে মাসলূবিয়্যত " বা ঈসা আ. কে শূলিতে চড়ানোর আকীদারই একটি অংশ বললে ভুল হবে না। এর বিস্তারিত বিবরণ এ রকম , হযরত ঈসা আ. কে শূলিতে চড়িয়ে তাঁকে দাফন করা হয়। এর তিন দিন পর তিনি পুনরায় জীবিত হয়ে হাওয়ারীদেরকে কিছু বিষয়ে নসীহত করেন। এরপর আসমানে চলে যান। তবে তিনি পুনরায় একটি বিশেষ সময়ে দুনিয়াতে অবতরণ করবেন ।

৬. পবিত্র শূলি। যেহেতু তাদের বিশ্বাস হলো হযরত ঈসা আ. কে শূলীতে চড়ানো হয়েছে , তাই এ শূলির নিদর্শন তাদের কাছে অনেক মূল্যবান সম্পদ বলে পরিগণিত । খৃস্টানদের কোনো সূত্রে এর বিস্তর কোনো নিদর্শন দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে , পূর্ববর্তী ইতিহাস ও গবেষণা অনুযায়ী ইন্ডিয়া, ব্রিটেন , মিসর , চায়না ও মধ্য আমেরিকা সহ কোনো কোনো জায়গায় হজরত মাসীহ আ. সংক্রান্ত খুবই সামান্য ও পরিবর্তিত কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়।

৭. কাফফারা। এ আকীদা খৃস্টান ধর্মের মূল ভিত মনে করা হয়। এর দ্বারা ব্যাখ্যা হলো , হযরত আদম আ. ও হাওয়া আ. নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে যে গোনাহ করেছিলেন এর বোঝা নিয়ে সকল মানবজাতি জন্মগ্রহণ করে । হযরত ঈসা আ. শূলিতে চড়ে সেই গোনাহের কাফফারা দিয়েছেন এবং পুরো মানব জাতিকে এ বোঝা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। যা ইতিপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে।

খৃস্টান ধর্ম ও মুক্তির পথ

খৃস্টানদের কাছে নাজাতের মূল ভিত্তি কয়েকটি জিনিসের উপর । ইউহান্নার ইঞ্জীলের ভাষ্য মতে মুক্তির মৌলিক তিন শর্ত রয়েছে-

১. প্রতিটি মানুষ নিজের কৃতকর্ম হিসেবে নিজেকে একজন গোনাহগার মনে করবে। এবং কৃতকর্মের কথা স্বীকার করবে ।

২. এবং বিশ্বাস করবে যে , মানুষের কোন কাজই মুক্তি লাভের মাধ্যম হতে পারবে না ; যতক্ষণ না সৃষ্টিকর্তার দয়া শামিল না হয়।

৩. ঈসা আ. ' র উপর নিজের নাজাতের জন্যে পূর্ণ ভরসা রাখতে হবে ।

গোনাহের স্বীকারোক্তি

বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী , মুক্তি লাভের জন্য মানুষ শুধু নিজের ভালো কাজের উপরই ভরসা করতে পারে না ; বরং ভালো কাজ রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্যই করতে হবে । বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী

পল বলেছেন , আমাদের মুক্তি আমাদের ভালো কাজের মাধ্যমে অর্জিত হবে না , বরং আমাদের ঈমানের মাধ্যমে অর্জিত হবে ।

ঠিক একই কথা বাইবেলে নবীগণের ব্যাপারে পাওয়া যায়। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে , খৃস্টানদের কাছে ভালো কাজের কোন গুরুত্ব নেই , এমনও নয়। কেননা তাদের বিশ্বাস হলো , যদি মানুষের জীবনে কোনো ভালো কাজ না থাকে তাহলে বুঝতে হবে ঈসা আ. এর উপর তার পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিল না। তাই সে ভালো কাজ করেনি। হযরত ঈসা আ. এর উপর সঠিক বিশ্বাস থাকলে অবশ্যই সে নিজের জীবনকে ভালো কাজে ব্যয় করত ।

হযরত ঈসা আ. এর উপর ঈমান

খৃস্টানরা বিশ্বাস করে , মানুষের নাজাতের জন্যে হযরত ঈসা আ. এর উপর পরিপূর্ণ ঈমান আনা আবশ্যক। পরিপূর্ণ ঈমান আনায়ন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো , এ বিশ্বাস করা যে তিনি আল্লাহ তাআলার দূৎ৷ তবে অধিকাংশ গবেষকদের মতে , ঈসা আ. এর উপর ঈমান আনয়ন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পূর্ব বর্ণিত সকল বিষয়ের উপর ঈমান আনা । যেমন , আকীদায়ে মাসলূবিয়্যাত তথা শূলিতে চড়ানোর আকীদা , পুনরায় জীবিত হওয়ার আকীদা , ইত্যাদি।

শূলীতে চড়ানোর বিষয়ে খৃস্টানদের থেকে অনেক আজগুবি কথাবার্তাও বর্ণিত আছে। তাদের কথা অনুযায়ী শূলী হযরত ঈসা আ. এর অমর কুরবানীর একটি মহামূল্যবান নিদর্শন। যে কুরবানী তিনি মানবজাতির কল্যাণে দিয়েছিলেন। খৃস্টানরা হযরত ঈসা আ. এর দিকে একটা কথা নিসবত করে। তা হলো, শূলীর ঘটনার পূর্বে হযরত ঈসা আ. নাকি এ কথা বলতেন - " কেউ আমার অনুসরণ করতে চাইলে সে যেন তার নফসের কথা চিন্তা না করে , এবং আমার শূলির লাকড়ি বহন করে।"

হযরত ঈসা আ. এমন কোন কথা বলেছিলেন কিনা , এর কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ তারা দিতে পারবে না।

রোমানদের ব্যাপারে একটি কথা প্রসিদ্ধ আছে , শূলী চড়ানোর দলিল তারা এভাবে দিয়ে থাকে যে , যিশুখৃস্টের পক্ষ থেকে নাকি শূলীর মাধ্যমে জীবনকে শেষ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। বাস্তবেই যদি এ কথা বর্ণিত থাকে , তাহলে নিজেকে শূলিতে চড়ানোর অর্থ ধরা হবে , নিজের নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দুনিয়ার জীবন ছেড়ে আখেরাতের জীবনের জন্য প্রস্তুতি নেয়া ।

রাহবানিয়্যত (Asceticism) বা সন্ন্যাসবাদ

এ মতাদর্শের ব্যাখ্যা অনুযায়ী , মানবিক শরীর সমস্ত খারাপের ফ্যাক্টরি , আর রুহ হলো একটি পবিত্র জিনিস । মানুষ তার শারীরিক চাহিদাগুলো দাফন করার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জীবনে বেশি অগ্রসর হতে পারবে। উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে পৌঁছতে পারবে। খৃস্টান ধর্ম ছাড়াও বিভিন্ন পুরাতন ধর্মেও এই মতাদর্শ দেখা যায়। যেমন হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম ।

উপাসনা পদ্ধতি :

তামীদ - অপ্সুদীক্ষা বা বাপ্তিস্মের বিশ্বাস

খৃস্টধর্মে নবজাতকের কপালে পবিত্র পানির ছিটা দিয়ে , পবিত্র করে পরিপূর্ণরুপে এ ধর্মে প্রবেশের বিশ্বাস পোষণ করা হয়। এ কাজ সম্পাদন করেন তাদের জ্যোতিষ বাবা। সে এ সময় পিতা, ছেলে ও রুহুল কুদসের নামে নবজাতকের শরীরে পানির ছিটা দেয়। প্রয়োজনের সময় জ্যোতিষী ছাড়াও অন্য কেউ এ কাজ সম্পাদন করতে পারে। তখন এটাকে তামীদুয যরুরাত বলা হয়, অর্থাৎ প্রয়োজনের সময় পানির ছিটে দেওয়া ।

এ কাজ তিনবার দেয়া হয় । গোনাহ থেকে পবিত্রতা লাভের জন্য ঈসায়ীদের কাছে এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্মপন্থা।

তারা বিশ্বাস করে , হযরত ইয়াহইয়া আ. মানুষদেরকে ' জর্ডান নদী ' তে গোসল করার মাধ্যমে পবিত্র করতেন। তিনি হযরত ঈসা আ. কে পানির ছিটা দিয়েছিলেন , এজন্য তাঁকে " ইউহান্না আল মা' দেন " বলা হয়।

হযরত ঈসা আ. এর জন্মদিন পালন

খৃস্টানরা হযরত ঈসা আ. এর জন্মের উৎসব খুব গুরুত্বের সাথে উৎযাপন করে থাকে। মীলাদে মাসীহের এ জলসাকে " ক্রিসমাস " (বা বড়দিন) ও বলে। এ উৎসব বছরের শেষের দিনগুলোতে বিশেষকরে ২৫ ডিসেম্বরে উদযাপন করা হয়। এক সময় উৎসবের এ দিনে অন্যান্য জাতিদের উপর জুলুম-অত্যাচার আর মদ পান করে পালন করা হত। আজও এ একদিনেই যেন পুরা বছরের সমান মদ পান করে তারা।

Lord's Supper বা dinner in god's night (রবের রাতে খানার আয়োজন) এর ব্যাখ্যা

খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল যা হযরত ঈসা আ. এর কুরবানীর স্মরণে করা হয় তা হলো , এ রাতে খানার আয়োজন করা। খৃস্টানদের ভাষ্য মতে এর ইতিহাস হলো , হযরত ঈসা আ. গ্রেফতার হওয়ার এক দিন পূর্বে হাওয়ারীদের সাথে রাতের খানা খেয়েছেন। সে স্মৃতি ধরে রাখতেই এ রাতে খানার আয়োজন করা হয়। এই বৈঠক সম্পর্কে বর্তমান " ইঞ্জীলে মাত্তা " ' র মধ্যে বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে। বর্ণনা করা হয়, হযরত ঈসা আ. খানা খাওয়ার এক পর্যায়ে একটি রুটি ছিঁড়ে তাতে বরকত দেন। এবং তা সাথীদের দিয়ে বলেন , তোমরা খাও; এটি আমার শরীরের অংশ। অতঃপর একটি পাত্র নিয়ে শুকরিয়া আদায়

করে সাথীদের দেন এবং বলেন , তোমরা এটা পান কর এটা আমার রক্ত , এটা শুধু উত্তম লোকদের গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়ার জন্যেই প্রবাহিত করা হয় ।[৩]

লুকা এ ঘটনার বর্ণনায় আরেকটু বাড়িয়েছেন , তা হলো, " এসব করার পর হযরত ঈসা আ. হাওয়ারীদের বললেন, তোমরা আমার স্বরণে এ কাজগুলো করবে "।[৪]

মাওলানা তাকি উসমানী দা. বা. প্রসিদ্ধ পাদ্রি জাস্টিন মারটেনের বর্ণনা অনুযায়ী লেখেন ,

তারা এ রীতিটি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে একটি সিস্টেম গ্রহণ করে। তা হলো , প্রত্যেক রবিবার গির্জায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং শুরুতে কিছু দোয়া পড়া হবে , গজল গাওয়া হবে। এরপর উপস্থিত একজন অপরজনকে চুমু খেয়ে মোবারক বাদ দিবে। এরপর রুটি ও মদ আনা হবে এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি এগুলো সামনে রেখে পিতা , পুত্র ও রুহুল কুদস এর বরকতের জন্য দুআ করবে আর উপস্থিত সকলেই তখন আমীন বলবে। দুআ শেষ হলে গির্জার সেবকরা সেই রুটি ও মদ বণ্টন করে দিবে । তখন এ রুটি হযরত ঈসা আ. এর শরীরের অংশ বিশেষ হয়ে আর মদ তাঁর রক্তে পরিণত হয়ে ভক্ষকদের শরীরে প্রবেশ করবে । এভাবে খানার আয়োজন করে খৃস্টানরা প্রতিবার তাদের গোনাহের কাফফারা আদায় করার আকীদাকে মজবুত করে চলবে ।[৫]

এ কথা জানা থাকা দরকার , সময়ের সাথে সাথে এই আয়োজনের সিস্টেমে অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে। এবং

---

[৩] (ইঞ্জীলে মাত্তা , ২৬)

[৪] (লুকা , ২২: ১৯)

[৫] (সূত্র : বাইবেল সে কুরআন তক , ভূমিকা , ১/ ৮৬)

এর শব্দের মাঝেও অনেক পরিবর্তন এসেছে , কিন্তু মৌলিক বিষয়গুলোতে কোন রকমের পরিবর্তন আনা হয়নি। এ রাতের রুটি ও মদ হযরত ঈসা আ. এর গোশত ও রক্তে পরিণত হওয়ার বিশ্বাস এখনো বাকি আছে। তারা মনে করে , যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা অনুভব করা যায় না , কিন্তু বাস্তবেই এ রুটি ও মদ খেলে হযরত ঈসা আ. ' র একটি অংশই যেনো তাদের মাঝে ঢুকে যায়া। এ খানার ফলে ভক্ষণকারীর মাঝে অতিশীঘ্রই হযরত ঈসা আ. এর শিক্ষা সহজেই এসে যায়।

এছাড়া আরো অনেক উৎসব তাদের ধর্মে প্রচলিত রয়েছে। যেমন, ঈদুল ফিসহ, শুকরানা, পবিত্র খাবার ও পবিত্র একাত্মতা, ইদ্যাদি ।

রোযা

তাদের মতে সকাল থেকে সূর্য্য পশ্চিম দিকে ঢলে যাওয়া পর্যন্ত না খেয়ে থাকাকে রোযা বলা হয়। এ সময়ের পর চর্বি ছাড়া খাবার খাওয়া যাবে। তবে , এটা নফল রোযা , আবশ্যক রোজা নয়। রাখা না রাখা দু' টোরই অধিকার রয়েছে।

খ্রীস্টানরা বুধবার রোজা রাখে , তাদের বিশ্বাস , এই দিনেই হযরত ঈসা আ. কে গ্রেফতার করা হয়েছিল। শুক্রবারও তাদের রোজার দিন; তাদের ধারণা অনুযায়ী , ঈসা আ. কে এ দিন শূলিতে চড়ানো হয়েছিল ।

এমনিভাবে তারা হযরত ঈসা আ. এর জন্মের দিনকে সামনে রেখেও রোজা রাখে। তাদের ধর্ম মতে , জন্মদিনের পূর্বের ধারাবাহিক ৪২ দিন রোজা রাখার হুকুম রয়েছে , যে ধারাবাহিকতা হযরত ঈসা আ. এর জন্মের তারিখে এসে শেষ হয়। এছাড়া " পবিত্র রোজা " বলে ৫৫ দিনের রোজাও তাদের ধর্মে পালন হয়ে থাকে। জন্মকেন্দ্রিক রোজাগুলো " চল্লিশা " বা চল্লিশ দিনের রোজা হিসেবে প্রসিদ্ধ। তাদের ধারণা , হযরত

ঈসা আ. নাকি এই চল্লিশ দিন রোজা রাখতেন । এই দিনগুলোতে প্রাণী ও তা থেকে সৃষ্ট কিংবা তৈরিকৃত জিনিসপত্র থেকে বিরত থাকতে হয়।

" সওমে রুসুল " (বা দূতগণের রোজা) বলেও তাদের ধর্মে এক প্রকার রোজার কথা পাওয়া যায়। এ রোজা ১৫ থেকে ৪৯ টি হয়ে থাকে । এ সংখ্যার মাঝে কম বেশিরও অনুমতি রয়েছে৷

খৃস্টান ধর্মে আরেক প্রকার রোজা রয়েছে যা " আযরা " নামে প্রসিদ্ধ । এ রোজা ১৫ দিনের হয়ে থাকে । এমনিভাবে " আহলে নিনাওয়া " নামেও এক প্রকার রোযা রয়েছে , এর সূচনা সোমবার থেকে শুরু হয়ে বুধবার শেষ হয় ।

উপাসনার বিভিন্ন রীতি :

খৃস্টানদের উপাসনার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যেমন :

সাত নামাজ বা ইশ্বরের উপাসনা :

তারা রাত দিন সাতবার নামাজ পড়ে ,

১. সকালের নামাজ

২. তিনটার নামাজ

৩.ছয়টার নামাজ

৪. নয়টার নামাজ

৫. এগারোটার নামাজ

৬. বারোটার নামাজ

৭. অর্ধেক রাতের নামাজ

তবে , তাদের নামাজ বলতে , দোয়াকেই বুঝায়। শুধু দোয়াই হচ্ছে তাদের নামাজ। তাদের মধ্যে কেউ এভাবে দোয়া করে : হে আমাদের পিতা ! - যিনি আকাশে রয়েছেন তাঁর নাম পবিত্র হোক - আপনার ফেরেশতা অবতীর্ণ হোক , আমার ইচ্ছা

তেমনি হোক যেমন আকাশে আপনার ইচ্ছা , পৃথিবীতে আপনি আমাদের রুটি- রোজগারের জন্য যথেষ্ট , আপনি প্রতিদিন আমাদের রুজির ব্যবস্থা করে দিন , আমাদের গোনাহসমূহ মাফ করে দিন , কেননা যারা আমাদের সাথে অন্যায় আচরণ করে তাদেরকে আমরাও মাফ করে দেই , আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলবেন না , আমাদেরকে সব রকমের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন !

হামদখানী বা প্রশংসাপাঠ

এটা হলো খৃস্টানদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাসনা পদ্ধতি। এর জন্য তারা প্রতিদিন সকাল- বিকেল গির্জায় সমবেত হয়। এর নিয়ম হলো , একজন তাওরাত তেলাওয়াত করে , বাকি সবাই দাঁড়িয়ে তা শ্রবণ করে এবং দোয়া করে। তাদের ধর্মে কেঁদে কেঁদে দোয়া করাকেও পছন্দনীয় আমলসমূহের মধ্যে গণ্য করা হয়।

খৃস্টানদের বিভিন্ন গ্রুপ বিভিন্নভাবে উপাসনা করে। তবে , রবিবারে গির্জায় সমবেত হওয়া, বাইবেল তেলাওয়াত করা , মেহমানদারি করা , খুৎবা প্রদান করা , তাছাড়া বর্তমানে বিভিন্ন গির্জায় সঙ্গীতেরও ব্যবস্থা করা হয় , যা বিভিন্ন গীত ও ঈসা আ. এর প্রশংসা সংবলিত থাকে , এগুলো প্রায় সব খৃস্টানরাই পালন করে ।

খৃস্টানদের সামাজিক বিভিন্ন রসম- রেওয়াজ

তাদের মতে নারী- পুরুষ সবার জন্য সন্ন্যাসের জীবন যাপন করা জায়েয ও ভালো কাজ। তবে , সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করা কারো জন্য কঠিন হয়ে পড়লে এবং যিনার প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিলে , তখন বিয়ে করে নেয়া জায়েয আছে। খৃস্টান ধর্মের মৌলিক নীতিমালা অনুযায়ী ভিন্ন ধর্ম ও দলের কারো সাথে বিয়ে করা বৈধ আছে। তবে , ধর্ম ও দলের একতা

হিসেবে একজন খৃস্টান শুধু নিজেদের লোকদের সাথেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

এ ব্যাপারে অর্থোডক্স খৃস্টানদের নীতিমালা অনেক কঠিন। তারা ভিন্ন ধর্মের কারো সাথে বিবাহকে বাতিল সাব্যস্ত করে। কিন্তু রোমীয় ক্যাথোলিক খৃস্টানরা এ ক্ষেত্রে অর্থোডক্সদের ভীষণ বিরোধিতা করে। তারা তাদের ধর্মের নীতিমালা অনুযায়ী এ ধরণের বিবাহকেও বৈধ বলে থাকে।

বিবাহের পর স্বামী বংশের মূল ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। বংশের খরচ সেই বহন করে। যা তার উপর ওয়াজিব ও আবশ্যক। তবে স্ত্রী বংশের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বামীর সহযোগী হয়ে থাকে।

ফ্রান্সের খৃস্টানরা তাদের নীতিমালা প্রণয়নে এবং বিবাহ আইন বাস্তবায়নে আবেদন জারি করে , নারীরা যেন তাদের সাধ্যের কাজগুলো স্বামীদের কাছে পেশ করে।

তাদের অর্থনৈতিক নীতিমালা অনুযায়ী , স্বামী স্ত্রীর সম্পদ থেকে চার ভাগের এক ভাগ নিয়ে নেয়। চাই সেটা দু' জনের শরীকানা সম্পত্তি হোক কিংবা শুধু স্ত্রীর মালিকানায় থাকুক।

খৃস্টানদের নীতি হলো , স্ত্রী কোন জিনিসের একক মালিক হলে তখনো তার জন্য পারিবারিক খরচ উঠানোর ক্ষেত্রে কয়েকটি নীতিমালা প্রযোজ্য হবে :

১. সন্তান নেওয়ার ক্ষেত্রে স্বামীর পরিপূর্ণ অধিকার থাকবে , তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রী বাচ্চা নিতে পারবে না।

২. স্ত্রী তার স্বামীর নাম নির্বাচন করতে পারবে। নতুন কোন নামও রাখতে পারবে।

৩. স্ত্রীর সম্পদে স্বামীর অধিকার থাকবে। তাই স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া অসিয়ত করতে পারবে না।

৪. বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর ন্যাশনালিটি গ্রহণ করবে।

মিরাস

খৃস্টান ধর্মে উত্তরাধিকারের কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতিমালা নেই। অধিকাংশ খৃস্টানই তাদের ওসিয়ত জারজ সন্তানদের জন্য করে থাকে। তবে বর্তমানে অনেক খৃস্টানরা ইসলামের মীরাছের বিষয়টি উপলব্ধি করে তারাও তাদের আইনে মীরাছের বিধান অন্তর্ভুক্ত করেছে। এবং আজকাল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রগুলোর মিরাসের নিয়মনীতি ফলো করেই খৃস্টানরা নিজেদের মিরাসের নীতিমালা নির্ধারণ করছে।

তালাক

ক্যাথোলিক খৃস্টানদের নিকট তালাক সর্বদাই হারাম। তাদের মতে , তালাক অত্যন্ত কষ্টদায়ক বিষয় ও মানবতার পরিপন্থী। তাই এতে ধর্মীয় বৈধতা দেয়া যায় না। এজন্য তারা তালাককে নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করে। স্বামী- স্ত্রীর জীবনে যতই কষ্ট আসুক না কেন ; এমনকি স্ত্রী স্বামীর অধীনে থাকাবস্থায় ব্যভিচারে লিপ্ত হলেও না ! তবে , এ ক্ষেত্রে সর্বশেষ উপায় হিসেবে সুরাহার পদ্ধতি হচ্ছে , তারা দু' জন শারীরিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু , দু' জনের কেউই অন্য কোথাও বিবাহ করতে পারবে না। হ্যাঁ , তবে তাদের মাঝে বন্ধুত্বের দরোজা সর্বদা খোলা থাকবে !

প্রোটেস্ট্যান্ট এবং অর্থোডক্স খৃস্টানরা দু' ক্ষেত্রে তালাককে বৈধ বলে। স্বামী, স্ত্রীর কেউ জিনা করলে আর ধর্ম পরিবর্তন করলে। কিন্তু সাথে সাথে তারা এটাও বলে , বিচ্ছেদের পর স্বামী ও স্ত্রী কেউ কোনক্রমেই অন্যের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না।

Sacraments (সেক্র্যামেন্টস) বা পবিত্র রীতিনীতিসমূহ

খৃস্টান ধর্মে উপাসনা ছাড়াও কিছু রীতিনীতি পালন করা হয়। ক্যাথোলিকরা সাতটি রীতিনীতি পালন করে। আর

প্রোটেস্ট্যান্টরা সাতটির কিছু পালন করে । এমনিভাবে অর্থোডক্সরাও কিছু কিছু পালন করে। এগুলোর বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো :

১. Baptism বা দীক্ষাদান উৎসব : তাদের পবিত্র রীতিসমূহের মাঝে এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ রসম। যা মূলত এক বিশেষ রকমের গোসল। নতুন খৃস্টান ধর্ম গ্রহণকারীদের এ গোসল করানো হয়। তাদের নিয়ম- রীতি অনুযায়ী , এ গোসল ব্যতীত কোন মানুষ খৃস্টান হতেই পারবে না। তাদের মতে এ গোসল করার পর হযরত ঈসা আ. এর মাধ্যমে মানুষ একটি নতুন জীবন শুরু করে।

এ গোসলের পদ্ধতি

যে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করার ইচ্ছা করে তাকে পশ্চিম দিকে মুখ করিয়ে একটি কামরায় শুইয়ে দেয়া হয়। এরপর সে তার উভয় হাত পশ্চিম দিকে লম্বা করে বিছিয়ে বলে , হে শয়তান ! আমি তোর থেকে এবং তোর সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত হচ্ছি । এরপর পূর্ব দিকে মুখ ফিরিয়ে হযরত ঈসা আ. এর ধর্মের আকীদাসমূহ স্বীকার করে । এরপর তাকে অন্য একটি রুমে নিয়ে বিবস্ত্র করে মাথা হতে পা পর্যন্ত পড়াতেলে মালিশ করা হয়। অত:পর তাকে একটি হাউজে নামিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি খৃস্টান ধর্মের মৌলিক আকীদাসমূহের উপর ঈমান এনেছো কিনা ? হ্যাঁ উত্তর দেবার পর তাকে হাউজ থেকে বাহির করে সাদা কাপড় পরানো হয় , যা এ কথার দলীল বহন করে , লোকটি এখনি সমস্ত গোনাহ থেকে পবিত্র হয়ে গেল ।

২. ওয়াদা : ক্যাথোলিকরা দীক্ষাদানের সময়ই খৃস্টান ধর্মের সকল আকীদায় অটল থাকার ওয়াদা নিয়ে ফেলে। এবং এর মাধ্যমে নাকি একজন খৃস্টানের দীক্ষাদান পূর্ণতা পায় । সাধারণত এ ওয়াদা যুবকদের থেকে নেয়া হয় । দীক্ষা

গ্রহণকারী থেকে কিছু ওয়াদা নেওয়া হয় । এরপর গির্জার সেবক তার মাথার উপর হাত রেখে আংটির মাধ্যমে মাথায় যাইতুন তেল মালিশ করে দেয়। এবং বলে , রুহুল কুদস নাকি এখন থেকে তার সাথেই আছে ।

৩. রবের রাতের খানা (encharist) : ইঞ্জীলে মাত্তা ও ইঞ্জীলে লুকার ভাষ্য মতে হযরত ঈসা আ. গ্রেফতার হওয়ার আগের রাতে তাঁর সমস্ত হাওয়ারীদের একত্র করে খাবার খাইয়েছিলেন । সেই ভোজনের স্বরণেই " আশায়ে রাব্বানী " ' র অনুষ্ঠান পালন করা হয়। একে Arranging Dinner on Lord's Night বা " Lord's Supper " (রবের রাতে খানার আয়োজন) ও বলা হয়ে থাকে। এ খানাকে খৃস্টানরা হযরত ঈসার অংশ মনে করে । এর বিস্তারিত বিবরণ ইতোপূর্বেও এসেছে।

৪. তাওবা ও কাফফারা : ক্যাথোলিক চার্চের ভাষ্য অনুযায়ী , বছরে একবার গোনাহের স্বীকারোক্তি করে তাওবা করা উচিত। খৃস্টানরা চার্চের ফাদারের কাছে গোনাহের স্বীকারোক্তি দেয়া অবশ্যক বলে মনে করে। এবং ফাদারের কাছেই ক্ষমা চাইতে হয়। এ সময়ে উভয়ের মাঝে পর্দা টানানো থাকে । ক্ষমা চাওয়ার বেলা পাদ্রি তাকে ভবিষ্যতের দিনগুলোতে কীভাবে চলতে হবে , সে বিষয়ে গাইড করে। এভাবে তওবা করার সময় শুধু গোনাহের স্বীকারোক্তি দেয়াই যথেষ্ট নয় ; বরং মনের সমস্ত কথা ফাদারের কাছে বলতে হয়। সবশেষে ফাদার তাকে দোয়া দেয় এবং এ কথা বলে , তাওবাকারী ও গোনাহ স্বীকারকারী নিজের সমস্ত গোনাহ থেকে পবিত্রতা অর্জন করে। তওবার কারণে সকল গোনাহ থেকে সে এখন পবিত্র ।

৫. রোগীদের মাসিহ : ক্যাথোলিক খৃস্টানদের নিকট এই রসম রোগীদের সাথে পালন করা হয়। বাইবেলের কিছু আয়াত পড়ে

রোগীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত যাইতুন তেল লাগানো হয়। এবং তার সুস্থতার জন্য দোয়া করা হয়। যদি রোগী পূর্বে গোনাহের স্বীকারোক্তি না করে থাকে তখন এই তেল দিয়ে রোগীকে গোনাহ থেকে পবিত্র করা হয় ।

৬. বিবাহ : এটাও তাদের কাছে অনেক মূল্যবান একটা কাজ বলে মনে করা হয় । তবে বিয়ের ব্যাপারে তাদের ধারণা হলো, বিয়ে এমন একটি সম্পর্ক যা থেকে মুক্তি পাওয়া কখনও সম্ভব নয়। তাই ক্যাথোলিক খৃস্টানদের নিকটেও বিশেষ বিশেষ কারণ ছাড়া বিবিকে তালাক দেয়া বৈধ হবে না ।

বিবাহের সময় তারা পোপের উপস্থিতিকে জরুরী বলে মনে করে। যাতে তার দোয়ায় স্বামী- স্ত্রীর মাঝে সমতা বজায় থাকে। এমনিভাবে মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির কাছেও পোপকে থাকতে হয়, যাতে সে তার শরীরে গোনাহ মাফের তেল মালিশ করতে পারে ।

৭. পবিত্র নিয়ম : ক্যাথোলিকরা তাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তিকে পোপ বানাতে চাইলে গির্জার পোপ সেই ব্যক্তির মাথায় হাত রাখে। এবং পবিত্র গ্রন্থ থেকে কিছু আয়াত পড়ে তাকে তাদের বিধানাবলী শুনিয়ে ভবিষ্যতের কাজের ওয়াদা নেয় । এটাকে পবিত্র নিয়ম বলে।

***

খৃস্টান ধর্মের গ্রন্থসমূহ :

খৃস্টানদের পবিত্র কিতাব হচ্ছে বাইবেল। যা মূলত দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগকে আহাদনামা কদীম বা ওল্ড টেস্টামেন্ট আর দ্বিতীয় ভাগকে আহাদনামা জাদীদ বা নিউ টেস্টামেন্ট বলে।

ওল্ড টেস্টামেন্ট

ইহুদি, খৃস্টানদের মতে, বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের বিধানাবলী ইহুদি ও খৃস্টান দু' ধর্মের জন্যই প্রযোজ্য। এটাকে " তাওরাত "ও বলা হয়। এতে মোট ৩৯ টি অধ্যায় রয়েছে। তবে , খৃস্টানদের প্রোটেস্ট্যান্টের মতে , ৩৯ টি অধ্যায়ের মধ্যে সাতটি মূসা আ. ' র পরবর্তিতে কেউ যুক্ত করেছে। ওল্ড টেস্টামেন্টের সম্পর্ক হযরত ঈসা আলাই সাল্লাম এর পূর্ব যুগের সাথে। এতে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের তাওরাত সহ বনী ইসরাইলের অন্যান্য নবীগণের উপর অবতীর্ণ ছোট ছোট পুস্তকও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাইবেলের এই অংশটি পৃথিবী সৃষ্টি থেকে নিয়ে হযরত ঈসা আলাইহিস সাল্লামের জন্মের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনা সংবলিত ।

আহদনামা জাদীদ বা নিউ টেস্টামেন্ট

নিউ টেস্টামেন্টকে ইঞ্জীলও বলা হয়। যা মূলত হযরত ঈসা আলাইহিস সাল্লাম এর উপর অবতীর্ণকৃত আকিদা এবং তাঁর পূর্ববর্তি বিভিন্ন ঘটনার বিবরণসমূহ সংবলিত গ্রন্থের নাম। সামষ্টিকভাবে এতে এমন সাতাশটি কিতাব (অধ্যায়) রয়েছে যেগুলো বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে খ্রিস্টান পণ্ডিতরা একমত পোষণ করে। এগুলোর মধ্যে চার ইঞ্জীলও অন্তর্ভুক্ত : ১- ইঞ্জীলে মাত্তা , ২- ইঞ্জীলে মার্কাস , ৩- ইঞ্জীলে লুকা , এবং ৪- ইঞ্জীলে ইউহান্না। এছাড়া নবীগণের আমলসমূহ

সংবলিত খৃস্টানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাবও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাছাড়া কিছু চিঠিও শামিল করা হয়েছে , যেগুলো প্রসিদ্ধ খৃস্টান পণ্ডিত পল ও অন্যান্য খৃস্টান লেখকরা লিখেছিলেন । এগুলো ব্যতীত তাতে ১১৪ টি অধ্যায়ও রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

চার ইঞ্জীল (gosples)

ইঞ্জীল শব্দটি গ্রিক ভাষার শব্দ। এর মূল হচ্ছে " ইউনজিলিয়োঁ "। যার অর্থ হচ্ছে ঐ সমস্ত পুরস্কার যেগুলো সুসংবাদ প্রদানে দেওয়া হয়। ইঞ্জীলসমূহে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর জীবনী ও তাঁর বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত আছে। এ ইঞ্জীলসমূহ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পর তাঁর হাওয়ারীগণ এবং তাদের ছাত্ররা লিপিবদ্ধ করেন ।

লুকা তাঁর লিখিত ইঞ্জীলের শুরুতে একথা স্পষ্ট ব্যক্ত করেছেন, তিনি ছাড়াও আরো অনেকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বিভিন্ন ঘটনা ও কাজকর্ম নোট করেছেন। খ্রিস্টান পণ্ডিতরা ১৫৮ কিতাবের কথা বলে থাকে , যেগুলো মূলত হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জীবনী সম্পর্কে লেখা হয়েছে। তম্মধ্যে অল্প সংখ্যক কিতাবেরই গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে । আর বাকিগুলোর কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই বললেই চলে । এ ইঞ্জীলসমূহের মধ্য হতে মাত্তা এবং ইউহান্না ছাড়া বাকি দু' জন (লুকা ও মার্ক) হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সরাসরি হাওয়ারী ছিলেন না ; বরং তারা ছিলেন হাওয়ারীদের ছাত্র ।

ইঞ্জীল লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে একটি কথা স্পষ্ট থাকা জরুরী। তা হলো , হযরত ঈসা আলাইহিস সাল্লাম ও তাঁর হাওয়ারীদের ভাষা ছিল " আরামী " (আরামাইক) ভাষা। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত ইঞ্জীলসমূহের মূল উৎস ইবরানী ও গ্রিক ভাষার

অনুবাদই বলা চলে। ইঞ্জীলের সবচেয়ে পুরোনো তিনটি নুসখা বা কপি চতুর্থ শতাব্দীতেই সর্বপ্রথম পাওয়া যায়।

পঞ্চম শতাব্দীতে খৃস্টানরা তাদের কাছে থাকা তাওরাতের সাতাশটি অংশ বা অধ্যায়কে গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করে। তারা এটাও স্বীকার করে, এগুলো আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত পবিত্র আছফার বা অধ্যায়সমূহ। যেগুলো হাওয়ারীগণ হযরত ঈসা আ. থেকে গুনাহসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করে পেয়েছিলেন।

চার ইঞ্জীলের প্রত্যেকটির লেখকই ঈসা আ. কে কেন্দ্র করেই তাদের ইঞ্জীলগুলো রচনা করেছেন। চাই তারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সরাসরি হাওয়ারীদের অন্তর্ভুক্ত হোক কিংবা হাওয়ারীদের ছাত্র হোক!

আহদে জাদীদ তথা নিউ টেস্টামেন্টের সামষ্টিক পৃষ্ঠা সংখ্যা সর্বোচ্চ ১১০ থেকে নিয়ে ২৫০ হবে।

চার ইঞ্জীলের বিস্তারিত বিবরণ :

১. ইঞ্জীলে মার্ক : চার ইঞ্জীলের মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন হচ্ছে এটি। অন্যান্য ইঞ্জীলগুলোর মধ্য হতে এর একটি বিশেষ অবস্থান রয়েছে। এর লেখক হলেন মার্কাস। তিনি গ্রীকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বংশগতভাবে ইহুদী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তিতে খ্রিস্টান ধর্মে বিশ্বাস করতে থাকেন। প্রথম প্রথম তিনি খ্রিস্টানদের পণ্ডিত পল ও বারনাবাসের সাথে বেশি থাকতেন। এরপর পাতরাসের সাথে থাকতে শুরু করেন। যখন রোমান সম্রাট নিরো খৃস্টানদের ব্যাপকভাবে হত্যা করতে লাগলো, এবং তার নির্যাতনে পাতরাসও শহীদ হয়ে যান, তখন মার্ক তাঁর এ ইঞ্জীল লিপিবদ্ধ করেন।

খ্রিস্টান পণ্ডিতরা এ কথার উপর একমত , মার্ক হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের হাওয়ারী ছিলেন না ; কিন্তু তিনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর বাণীসমূহ যেগুলো তিনি ওস্তাদ পাতরাসের কাছ থেকে শুনেছেন তা সব তাঁর ইঞ্জীলে লিখে দিয়েছেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন তাঁর ইঞ্জীল ল্যাটিন বা আরামী (আরামাইক) ভাষায় লেখা হয়েছিল। কিন্তু এর কোন প্রমাণ তাদের কাছে নেই। এটা তাদের দাবী মাত্র। তবে এই ইঞ্জীলের সবচে' পুরাতন কপি গ্রীক ভাষায় পাওয়া যায়। যা দেখে তাদের গবেষকরা বলে , হয়তবা কিতাবটি খৃস্টপূর্ব ৭০-৫৬ এর মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে লেখা হয়েছে।

২. ইঞ্জীলে মাত্তা : সবচেয়ে বড় ইঞ্জীলের লেখক হলেন " মাত্তা"। তাঁর জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। বলা হয় , ইনি ছাড়া মাত্তা নামী আরেকজন ছিলেন , যিনি হযরত ঈসা আ. এর হাওয়ারী। কিন্তু তিনি কোন কিতাব লিখেননি।

ইঞ্জীলে মাত্তা অন্যান্য ইঞ্জীল থেকে এ জন্য একটু আলাদা যে , তা গ্রীক ভাষার পরিবর্তে ইবরানী ভাষায় লেখা হয়েছিল। প্রফেসর বানীক তার কিতাব " What is Christianity " এ ইঞ্জীলে মাত্তা লেখার সময় ৮০- ১০০ খৃস্টপূর্ব বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনা অন্যান্য আলামত অনুযায়ী অনেকটা সঠিক বলে মনে করা হয়।

৩. ইঞ্জীলে লুক : লুক ছিলেন আনতাকার বাসিন্দা। তিনি একজন ডাক্তার ও ঐতিহাসিক ছিলেন। খৃস্টানধর্মে বিশ্বাস করতেন। তিনি বেশ কয়েকবার পলের সাথে দাওয়াতী সফরে বের হয়েছিলেন। তাঁর দিকে দু' টি কিতাব নিসবত করা হয় : ১. ইঞ্জীলে লুকা , ২. রাসূলগণের আমলসমূহ।

তিনি হযরত ঈসা আ. এর হাওয়ারী নন। তিনি তাঁর ইঞ্জীলের শুরুতে লিখেছেন , এ গ্রন্থ তিনি হযরত ঈসা আ. এর খেদমতে থাকা লোকদের মুখ থেকে শুনে শুনে একজন গ্রীক বাসিন্দা থিওফিলাসের অনুরোধে লিপিবদ্ধ করেছেন ।

৪. ইঞ্জীলে ইউহান্না : চতুর্থ ইঞ্জীল লিখেছেন ইউহান্না , তাকে ইংরেজিতে john (জোহন) ও বলে। ইঞ্জীলে ইউহান্না নিজস্ব বিন্যাস ও বিষয়াবলীর দিক থেকে অন্যান্য ইঞ্জীল থেকে অনেকটা ভিন্ন। এর ভঙ্গি অনেকটা র্দশন বিদ্যার মত। যার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে গ্রন্থের প্রথম পংক্তি থেকেই।

ইঞ্জীলে ইউহান্নাতে হযরত ঈসা আ. কে প্রভু বানানোর দিকে বেশি জোর দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইঞ্জীলে হযরত ঈসা আ. কে ইশ্বরের সেবক ও খোদার ছেলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

ইঞ্জীলে ইউহান্নার রচয়িতা কোন ইউহান্না এ নিয়েও ঐতিহাসিকদের মতানৈক্য রয়েছে। কারো কারো মতে তিনি হযরত ঈসা আ. এর হাওয়ারী ছিলেন। আর কারো মতে তিনি অন্য কেউ ছিলেন , তিনি মূলত তুরস্কে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। এবং খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীর শুরুর দিকে তাঁর মৃত্যু হয় । " মুকাশাফাতে ইউহান্না " নামেও তাঁর একটি গ্রন্থ পাওয়া যায়। বলা হয় , এর রচনাকাল হযরত ঈসা আ. এর মৃত্যুর ৯০ বছর পরের কোন এক সময় ।

খৃস্টানরা বলে , এ চার ইঞ্জীল ছাড়াও প্রথম শতাব্দীতে আরো অনেক ইঞ্জীল লেখা হয়েছিল। কিন্তু এগুলোর উপর ভরসা করা যায় না। খৃস্টান ধর্মের প্রত্যেক গোষ্ঠির পৃথক পৃথক ইঞ্জীল থাকে৷ যার উপর তারা পরিপূর্ণ বিশ্বাস করে। আর অন্যসব ইঞ্জীল থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

এ চার ইঞ্জীল ছাড়াও আরো অনেকেই ইঞ্জীল লিখেছেন। যেমন, ইয়াকূবের দিকে এক ইঞ্জীলের নিসবত করা হয়, এমনিভাবে টোমাস এর লেখা ইঞ্জীল রয়েছে। এসব ইঞ্জীলে হযরত ঈসা আ. ও তাঁর মাতা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো উপরোল্লেখিত চার ইঞ্জীলেও নেই।

পাদ্রি নেকোদীমের লেখা এক ইঞ্জীলও রয়েছে, তিনি হযরত ঈসা আ. এর উপর ঈমান আনার পর তাঁর এ ইঞ্জীল গ্রীক ভাষায় লিখেছেন। তাতে হযরত ঈসা আ. ' র মৃত্যু ও তাঁর পুনরায় অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে এমন এমন কথা লেখা আছে যা অন্যান্য ইঞ্জীলে পাওয়া যায় না।

এভাবে আরো অনেকেই ইঞ্জীল লিখেছেন, খৃস্টানদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ আরো কিছু ইঞ্জীলের নাম এখানে পেশ করা হলো,

১. ইঞ্জীলে সাবঈন, যা মূলত থ্যালামসের দিকে নিসবত করা হয়

২. ইঞ্জীলে ইছনা আশারা

৩. ইঞ্জীলে তাযকিরা

৪. ইঞ্জীলে ইবরানিয়্যীন

৫. ইঞ্জীলে নাসিরিয়ীন

৬. ইঞ্জীলে মিসরিয়ীন

এমনিভাবে প্রসিদ্ধ খৃস্টান পণ্ডিতগণ যেমন, দীচান, মানি ও মরসির অনুসরণকারীদেরও সতন্ত্র ইঞ্জীল ছিল। ইবয়ূনের অনুসরীদের আলাদা একটি ইঞ্জীল ছিল যা অন্যগুলোর সাথে মিলতো না। এছাড়া এমন আরো অনেক ইঞ্জীল অনেকেই লিখেছে, যেগুলো কালের বিবর্তনে অজানা দেশের অতল গহ্বরে তলিয়ে গিয়েছে।

" ইঞ্জীলে ইবিউনিউ " ' র বর্ণনা

এটা মূলত আরামী ভাষায় লেখা হয়েছে। খৃস্টানদের একটি গ্রুপ এই ইঞ্জীলের উপর খুব মজবুতভাবে আমল করত। ফলে তাদেরকে এ কিতাবের দিকে সম্বন্ধ করেই " ইভিনিয়ো " নামকরণ করা হয়। ইবিয়োন তাদের নেতার নাম ছিল। তাদের অস্তিত্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ছিল। এরপর তাদের অস্তিত্ব মিটে যায়। তারা হযরত মূসা আ. এর শরীয়তকেও সমর্থন করত এবং ঈসা আ. কে প্রতিশ্রুত মাসীহ মনে করত। তবে , তাঁকে খোদা মানত না। শুধু একজন মানুষ ও নবী মনে করত , যেমনটি ইসলামের বিশ্বাস। ঈসা আ. সম্পর্কিত তাদের আকীদাগুলো ইসলামের সাথে মিলে যায়।

ইঞ্জীলে বারনাবা

বারনামা পাদ্রির নামে এ ইঞ্জীলের নামকরণ করা হয়েছে। এটা অনেক আগ থেকেই প্রসিদ্ধ একটি ইঞ্জীল। এর বিবরণ পূর্ববর্তী চার্চ ও গির্জার পাদ্রিদের গবেষণা ও বিভিন্ন বক্তব্যেও পাওয়া যায়। এমনি একটি বক্তব্য বাবা প্রথম জিলাসিয়াস ঐসময়ে দিয়েছিলেন যখন তিনি ৪৯২ ঈসায়ী থেকে ৪৯৬ পর্যন্ত রোমের ক্যাথোলিক খৃস্টান চার্চের বাবা পদের দায়িত্ব পান। তিনি তার বক্তব্যে নিষিদ্ধ কিতাবসমূহের লিস্ট প্রকাশ করেন। এবং ইঞ্জীলে বারনাবা পড়তে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

নিষিদ্ধ কিতাবগুলোর মধ্যে বারনাবার কথাও তিনি বলেছেন। এ থেকে এটা বুঝা যায় , বারনাবার কিতাব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের দু' শত বছর আগ পর্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। অত:পর এর কপিগুলো হারিয়ে যায় কিংবা গুম করে দেওয়া হয়। তবে , এর পুরাতন একটি কপি রোমের পাদ্রি পঞ্চম স্কটসের লাইব্রেরীতে পাওয়া গেছে। এরপর খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সে কপিও পাদ্রির লাইব্রেরী থেকে উধাও

হয়ে যায়। এর অনেক দিন পর হারিয়ে যাওয়া কপি বা এর মত আরেকটি কপি

আমস্টারডামের এক সম্মানিত ব্যক্তির লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়৷ সেখানে তা আঠারো শতাব্দীর শেষ অবধি সংরক্ষিত ছিল। কিছু ঐতিহাসিকগণের সনদে বর্ণিত রয়েছে , এটি একজন ইহুদী লিখেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন । যেহেতু খৃস্টধর্ম ও ইসলামের মাঝে বেশ কিছু জিনিসের মিল রয়েছে , তাছাড়া এ কিতাবে উল্লেখিত খৃস্টধর্মে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে; তাই তিনি এসব অনুধাবন করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ।

রাশিয়ান এক বাদশাহ' র কোন একজন পরামর্শদাতা এ ইঞ্জীলের অনেক প্রশংসা করে এবং তা ধার করে লাইব্রেরী থেকে নিয়ে আসে৷ কিন্তু তখন সে কপি ফিনার ?? লাইব্রেরীতে স্থানান্তর করা হয় । ফিনার এই লাইব্রেরীতে আজও তা সংরক্ষিত রয়েছে। বারনাবার এ ইঞ্জীল ইটালী ভাষায় লেখা হয়েছে। আর প্রতি পৃষ্ঠার চার পাশে অশুদ্ধ আরবীতে টিকা সংযোজন করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় টিকার লেখক একজন অনারবী ছিলেন।

এর আরেকটি কপি স্পেনীয় ভাষায় ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়। কিন্তু অল্প কিছু দিনের মধ্যেই এটাও উধাও হয়ে যায়। অত:পর এক মুসলিম মনীষী আল্লামা রশীদ রেযা মিসরী রহ. এর একটি কপি বহু চেষ্টার পর খুঁজে পেয়ে প্রকাশিত করেন এবং এর শুরুতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা লিখে দেন । এ কিতাবের মাধ্যমেই খৃস্টান ধর্মে সংঘটিত পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের দলীল পাওয়া যায় । এর

সাথে অন্যান্য গ্রন্থ তুলনা করলেই বিজ্ঞরা বুঝতে পারবেন , খৃস্টধর্মে কী পরিমাণ উলটপালট করা হয়েছে ।

এ যুগে নতুন প্রজন্মের জন্য তৈরিকৃত বাইবলের বিভিন্ন অংশ :

উপরোল্লেখিত সকল প্রকার ইঞ্জীল ছাড়াও খৃস্টধর্মে আরো ২৩ টি আসফার বা রিসালা রয়েছে । এখানে কয়েকটির কিঞ্চিত পরিচিতি তুলে ধরা হলো :

১- লুকার উত্তরসূরিদের আমালের বর্ণনা সংবলিত অংশ এবং ইউহান্নার স্বপ্নসমূহ নিয়ে লিখিত রিসালা।

২- এছাড়া ইঞ্জীলের অন্তর্ভুক্ত প্রসিদ্ধ আরো দু' ধরণের সংকলন পাওয়া যায় :

১. পোলাসের লিখিত চিঠি ও চৌদ্দটা আসফার যা একই মলাটে বিদ্যমান।

২. ক্যাথোলিকদের লিখিত কতগুলো অংশের সমষ্টি , যাতে সাতটি আসফার রয়েছে ।

এ সকল ইঞ্জীলসমূহে খৃস্টান ধর্মের মৌলিক আকীদা , বিধান , উপাসনা ও চারিত্রিক গুণাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে । বিশেষত খৃস্টানদের ধর্মের মৌলিক আকীদা- বিশ্বাস যেমন , ত্রিত্ববাদ এবং বিভিন্ন রসম- রেওয়াজসমূহ খুবই গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে।

পলের চিঠি

বর্তমানের খৃস্টানরা নিউ টেস্টামেন্ট (ইঞ্জীল) ' র অন্যসব রিসালার তুলনায় পলের চিঠি ও তার শিক্ষাকে অধিক বেশি অনুসরণ করে এবং এর উপরই ভরসা করে । তারা পলের দেখানো পথেই চলতে পছন্দ করে । এমনকি "رسول " (রাসূল) শব্দ বলে তারা শুধুমাত্র পলকেই বুঝায় ।

পলের চিঠিসমূহ

পোল খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করার পর অনেক বড় কাজ সম্পাদন করেন৷ তিনি দাওয়াতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন এলাকায় সফর করেন এবং হযরত ঈসা আ. এর শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেন সর্বত্র । তিনি বিভিন্ন এলাকাবাসীর কাছে পালনীয় বিধান সংবলিত কিছু চিঠি প্রেরণ করেন । এ- সব চিঠির মধ্যে চৌদ্দটি ইঞ্জীলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । এগুলো খৃস্টধর্মের গঠন , আকীদা ও এর ব্যাখ্যা জানার জন্য অনেক বেশী প্রয়োজন পড়ে । পলের চিঠিগুলো থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে , পূর্ববর্তী যুগ সম্বন্ধে তার ব্যাপক জ্ঞান ছিল। তিনি ধর্মীয় বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতেন । তার লেখার ধরণ ছিল কিছুটা ভিন্ন ধরনের । তার চিঠিগুলোতে ধর্মীয় বিষয়াবলী ভরপুর থাকত, এটাই ছিল এগুলোর বিশেষ গুণ। তার চিঠি সংবলিত ইঞ্জীলে পাতরাস এবং ইয়াকুবের চিঠিসমূহও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।

ইউহান্নার চিঠিসমূহ ও তার বই " মুকাশিফাত "

ইউহান্নার মুকাশিফাত (The Book of Revelation) হলো, নিউ টেস্টামেন্টের শেষ কিতাব। এর সাথে তার লিখিত তিনটি চিঠিও নিউ টেস্টামেন্টে শামিল করা হয়েছে । খৃস্টানদের বিশ্বাস , ইউহান্না খৃস্টধর্ম গ্রহণের কারণে তাকে ব্রিটেন ও তুরকিস্তানের মধ্যবর্তী অবস্থিত প্যাটমাস দ্বীপে দেশান্তর করা হয়। এরপর সেখানেই তিনি জীবন যাপন করতে থাকেন। এ দ্বীপে থাকাকালীন তিনি সত্য কিছু স্বপ্ন দেখেন এবং সেগুলো তার গ্রন্থে লিখে দেন । এটিই " মুকাশিফাত " নামে প্রসিদ্ধ। এটিও তার ইঞ্জীলের মত ৯৬- ৯০ খৃস্টপূর্বাব্দের কোন এক সময় গ্রীক ভাষায় লেখা হয়।

ইঞ্জীলমূহের সত্যতা ও সঠিকতা

চার ইঞ্জীল সঠিক হওয়ার ব্যাপারে খৃস্টানদের বিশ্বাস রয়েছে। তারা এগুলোকে হযরত ঈসা আ. থেকে বর্ণিত বাণী মনে করে। তবে , এগুলো হযরত ঈসা আলাইহিস সাল্লাম এর বাণী হওয়ার ব্যাপারে গবেষকদের সন্দেহ রয়েছে। তাদের সন্দেহের পেছনে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হয় :

প্রথম কারণ : হযরত ঈসা আলাইহিস সাল্লাম যে তাওরাতের উপর ঈমান রাখতেন এ ইঞ্জীলসমূহ তা থেকে ভিন্ন , যে তাওরাতের পূর্ণতার জন্য আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা আ. কে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। তাওরাত মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে৷ অথচ এই ইঞ্জিলসমূহ ত্রিত্ববাদ বা তিন খোদার আকীদায় বিশ্বাস করতে বলে। এভাবে এগুলো হযরত ঈসা আ. , আহলে কিতাব এবং তাদের ইতিহাস ও বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনায় কোরআনে কারীমের বিরোধিতা করে। অথচ আহলে কিতাবদের সকল বিষয়গুলো আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওহী নাযিল করে জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা নবী কারীম সা.' র উপর কুরআনের ঐতিহাসিক আয়াত অবতীর্ণ করে সৃষ্টিকর্তা সংক্রান্ত খৃস্টানদের সকল ধারণাকে বাতিল বলেছেন, বর্ণিত হয়েছে ,

لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ـ سورة الأنبياء ـ ٢٢

অর্থাৎ , আসমান ও জমিনের দু' সৃষ্টিকর্তা হলে এবং দু' জন প্রতিপালক এগুলোর প্রতিপালন করলে নিশ্চিয় তা এতদিন ধ্বংস হয়ে যেত। কারণ , একই ক্ষমতায় দু' জন রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া কখনোই সম্ভব নয়।

সুরা ইখলাস অবতীর্ণ করে আল্লাহ তাআলা নিজের গুণ নিজেই বর্ণনা করেছেন ,

قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحدا

অর্থাৎ , আল্লাহ তাআলা এক ও একক । তাঁর কোন শরীক নেই৷ তিনি কারো থেকে জন্ম গ্রহণ করেননি । আবার কাউকে জন্ম দেননি । তাঁর সমতুল্য কেউ নেই । সুরা ইখলাস ।

একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট , ওহী কখনো মিথ্যা হতে পারে না। মানুষের আকল , জ্ঞান , বুদ্ধি সব কিছুই ভুল হতে পারে । কিন্তু আল্লাহর ওহীকে কেউ ভুল বা মিথ্যা সাব্যস্ত করতে পারবে না । তাই কারো সঠিক জ্ঞান থাকলে নিশ্চয় বুঝতে পারবে, খৃস্টানদের ওসব দাবি নিছক মনগড়া কথা এবং ভুল ও গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই নয়৷

দ্বিতীয় কারণ : এসব ইঞ্জীলের পারস্পরিক ভিন্নতা । এক ইঞ্জীলের কথা অন্যটির সাথে মিলে না । অধিকাংশ তথ্যে একটি আরেকটি থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত মনে হয় । আর এই বৈপরিত্বের কারণেই খৃস্টান পাদ্রিরা এর কোন সঠিক ও সন্তোষজনক জবাব আজও দিতে পারেনি । এবং কখনো পারবেও না । এই বিষয়টি স্বয়ং তাদের নিজেদেরকেও সন্দেহের সাগরে ফেলে দিয়েছে ।

তৃতীয় কারণ : এ সকল ইঞ্জীলগুলার মাঝে কিছু সঠিক তথ্যও রয়েছে । তবে , অধিকাংশই অবিশ্বাসযোগ্য । কুরআনে কারীম হুযূর সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায়ই সাহাবায়ে কেরাম তাঁর থেকে সরাসরি শুনে মুখস্ত করে নিয়েছেন৷ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে থেকে কোরআনে কারীমের প্রতিটি অক্ষর , শব্দ , বাক্য ও সুরা সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছেন । পক্ষান্তরে ইঞ্জীলের ক্ষেত্রে এমন কিছুই হয়নি । কারণ, ইঞ্জীল হযরত ঈসা আ. ' র মৃত্যুর বহু বছর পর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । তদুপরি এর শব্দ শব্দ লেখা হয়নি এবং হযরত ঈসা আ. ' র আদেশ , নিষেধকে সামনে রেখে লেখা হয়নি ; বরং শুধু কিছু

কিছু ভাব অর্থ তুলে ধরা হয়েছে , সে ব্যাখ্যা ও ভাব অর্থও আবার খৃস্টানদের নিজস্ব প্রণীত মনগড়া আকীদার সমর্থনেই লেখা হয়েছে !

অধিকাংশ ইঞ্জীল হযরত ঈসা আ. এর মৃত্যুর ১৪০ পর লেখা হয়েছে । এ ইঞ্জীলসমূহের সবচেয়ে মারাত্মক বিষয় হচ্ছে , এগুলোর অধিকাংশ সংকলন পলের ঐ সব আকীদা মোতাবেক করা হয়েছে , যেগুলো সে ৫৫ থেকে ৬৩ খৃ. মধ্যবর্তী সময়ে তার কিতাব " রাসায়েলে ইলাহিয়া " তে লিখেছিল। ঈসা আ. ' র মৃত্যুর পর এত দীর্ঘ সময় পার হওয়ার কারণে পল খৃস্টধর্মের আকীদাসমূহে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অনেক লম্বা টাইম পেয়েছেন । এবং সেটা তিনি ভালো করে কাজেও লাগিয়েছেন ।

চতুর্থ কারণ : এ সকল ইঞ্জীলসমূহে বর্ণিত অধিকাংশ বর্ণনা ও ঘটনা বর্তমান যুগের আবিষ্কার ও উদ্ভাবন এবং সাইন্স , বিজ্ঞান, দর্শন ও বিবেকের সম্পূর্ণ বিরোধি ।

***

খৃস্টানদের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও দলসমূহ :

একত্ববাদী গ্রুপ

খৃস্টানরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত। তাদের মধ্যে কোন কোন গ্রুপের উপর ইহুদী ও রোমীদের প্রভাব ছিল। আবার কোন কোন গ্রুপের উপর খৃস্টানদের অন্য গ্রুপ শক্তিশালী হওয়ার কারণে নির্যাতনও করতো। এভাবে কালপরিক্রমায় তাদের বহু দল ও গ্রুপও ইতিহাসের ছোঁয়া থেকে হারিয়ে যায়। এক সময় অনেক খৃস্টানদের মাঝে একত্ববাদের বিশ্বাস ছিল। তখন একত্ববাদীদের লিডার " আরিয়াস " জীবিত ছিলেন। তাঁর অনুসারীও ছিল অনেক বেশি। তাঁর অনুসারীদের মধ্যে কনস্টান্টিনোপলের প্রসিদ্ধ পাদ্রিরাও ছিল। তাঁর মতাদর্শ মিশর, সিরিয়া ও মেসিডোনিয়া সহ আরো বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

একত্ববাদীদের দলে পোলাস শ্যামাতীর অনুসারী ভরপুর ছিল। আল্লামা ইবনে হাজম রহ. ' র মতানুসারে , পোলস তুরস্কের আনতাকিয়া নামক শহরের একজন পাদ্রি ছিলেন। তিনি সঠিক ও বিশুদ্ধ আকীদায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন , হযরত ঈসা আ. আল্লাহ তাআলার সম্মানিত একজন বান্দা ও রাসূল। কোথাও হযরত ঈসা আ. ও রুহুল কুদস সম্পর্কে তর্কবিতর্ক অনুষ্ঠিত হলে তিনি খুব আগ্রহভরে তাতে অংশগ্রহণ করতেন।

মাকদুনিবাস (মেসিডোনিয়া) Macedonius of Constantinople গ্রুপ

এটিও একত্ববাদীদের একটি দল , যা প্রসিদ্ধ " নীকা কনফারেন্স" (Council of Nicaea- 325 A.D.) র পর

জনসাধারণের সম্মুখে আসে । এটা ঐ সময়ের কথা যখন সরকারী পর্যায়গুলোতে একত্ববাদ খৃস্টধর্ম থেকে মুছে গিয়েছিল৷ তবে , এদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল । বিভিন্ন সম্মানিত পদেও তারা সমাসীন ছিল । এ জন্যে সরকার " তাওহীদ " তথা সৃষ্টিকর্তার প্রতি একত্ববাদের বিশ্বাসকে খৃস্টধর্ম থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করতে না পারলেও একত্ববাদে বিশ্বাসীদেরকে গির্জাসমূহ থেকে দূরে সরতে বাধ্য করে। এবং এক সময় তাদেরকে দেশান্তরিত করা হয়। যাতে তাদের শিক্ষা সাধারণ মানুষ পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে। খোদাদ্রোহী সরকার ও বাদশাহদের এসব কর্মকাণ্ডের কারণেই ধীরে ধীরে মানুষেরা এক রবের পরিবর্তে স্বয়ং হযরত ঈসা আ.কেই খোদা মানতে শুরু করে৷ ফলশ্রুতিতে খৃস্টানদের গুটিকতকই বেঁচে থাকলো, যারা একত্ববাদ তথা এক সৃষ্টিকর্তার আকীদায় বিশ্বাস রাখত । এবং যারা জালিম সরকারদের তৈরিকৃত ভ্রান্ত আকীদাগুলোকে সাহসিকতার সহিত বাতিল বলে সাব্যস্ত করত। ক্ষমতার প্রভাবে গির্জার পণ্ডিতরাও তাদের বিরুদ্ধোচারণ করত৷ তবু, তারা নিজেদের মতাদর্শের প্রচার করে বেড়াত । খৃস্টানদের এ একটি দলই শুধু একত্ববাদের পতাকা আকড়ে ধরেছিল । এদের সাথে আরিয়াস সহ একত্ববাদের প্রবক্তা অন্যান্য খৃস্টানরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল । তারা বিভিন্ন কনফারেন্স করে লোকদেরকে সঠিক পথের দিশা দিত । তাদেরকে তাওহীদের দিকে ডাকত ।

ইবনে বাতরীক বলেন , দ্বিতীয় কনস্টান্টিনোপল তার ছেলেকে রাজত্বের দশম বছরে মাকদানিয়াসের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করেন। তিনি রুহুল কুদসকে সৃষ্টিকর্তা নয় ; বরং একজন সৃষ্টিজীব মনে করতেন । কনস্টান্টিনোপলের ছেলে এ দায়িত্ব দশ বছর পালন করেন । এরপর তার মৃত্যু হয়ে যায় । তার

বিরুদ্ধে তখন কুসতুনতুনিয়ায় অন্যান্য খৃস্টানরা অনেক আন্দোলন করে ।

নাসতোরিয়্যীন (নাসতোর গ্রুপ)

এটি মূলত কনস্টান্টিনোপলের এক পাদ্রির দল । তারাও মারয়াম আ. ও ঈসা আ. কে খোদা মানত না। বরং তাদের মতে, হযরত মারয়াম আ. ' র গর্ভ থেকে একজন মানুষেরই জন্ম হয়েছে ।

তবে , ত্রিত্ববাদের আকীদায় তারা ব্যাখ্যা করে বলত , রব , রুহুল কুদস আর ছেলে মিলেই হলো সৃষ্টিকর্তা। তবে , ছেলে বলতে মারয়ামপুত্র নয় ; বরং এমন সত্তা যার কোন শারীরিক আকৃতি নাই , হযরত মারয়াম তাকে জন্ম দেননি । মারয়াম তো শুধু একজন মানুষকেই জন্ম দিয়েছেন। তবে , সে তার জন্মের পর দ্বিতীয় খোদার সাথে মিশে গিয়েছিল ।

এই মিশে যাওয়াটা কোনো বাস্তবিক অর্থে নয় বরং রূপক অর্থে মিশে যাওয়া । কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁকে ভালবাসার নিদর্শন দিয়েছেন , এবং বিভিন্ন নিয়ামত প্রদানের মাধ্যমে তাঁকে পুরস্কৃত করেছেন। এভাবে তিনি ছেলের মর্যাদায় পৌঁছে গিয়েছেন।

নাসতুর তার আকীদা মোতাবেক বলেন , হযরত মাসীহা মানুষের সাথে কথা বলেছেন , চলাফেরা করেছেন। তবে, তাঁর ব্যাপারে লোকেরা ভুল ফায়সালা করেছে এবং তাঁকে শূলিতে চড়িয়ে শাস্তি দিয়েছে। এসব ঘটনা থেকে বুঝা যায় , তাঁর মাঝে ইশ্বর হওয়ার কোন যোগ্যতাই ছিল না। তিনি না কোন খোদা ছিলেন , না তিনি খোদার ছেলে। নাসতুর এসব কথা বললে তাকে মানুষেরা ভুল সাব্যস্ত করতে চাইল। কিন্তু তিনি মানুষের শত বাধা সত্ত্বেও আপন বিশ্বাসে অটুট ছিলেন। এবং নিজের মত থেকে ফিরে আসতে অসম্মতি প্রকাশ করেন ।

এরপর ৪৩১ খৃস্টাব্দে অফসেস বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । এর সর্বশেষ ফায়সালায় নাসতুরের উপর অভিশাপ দেয়া হয়। তার বিরোধিতা করা হয়। এবং ফায়সালা করা হয় , হযরত মারয়ম আ. একজন মানুষ হয়েও আল্লাহর পুত্রকে জন্ম দিয়েছেন , এ বিশ্বাসই পোষণ করতে হবে। এর সাথে নাসতুরকে তার পাদ্রি পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। তাকে দেশান্তরিত করা হয়। ফলে বাধ্য হয়ে তিনি মিসরে চলে যান। এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

ইবনে বাতরিক বর্ণনা করেন , ছাত্র ও অনুসারীর অভাবে নাসতোরের মৃত্যুর পর তার দাওয়াত একেবারে মিটে যায়। তবে তার মৃত্যুর বহুকাল পর পারস্যের বাদশাহ কুব্বাদ বিন ফাইরোজের সময়কালে বারসোমা নামী একজন ব্যক্তি তার দাওয়াতকে পুনরায় জীবিত করেন। পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোতে বিশেষকরে পারস্যে তার দাওয়াত ব্যাপকভাবে প্রচার প্রসার করেন। এর ফলস্বরূপ প্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে ইরাক, মসেল, আলজেরিয়ায় তাদের সংখ্যা বহু গুণ বেড়ে যায়। তারা আজও এসব অঞ্চলে বিদ্যমান। তাদের একটি গ্রুপ এখন ইন্ডিয়াতেও বসবাস করে । অন্যান্য অনারব দেশগুলোতেও তাদের বসবাস রয়েছে ।

নাসতোরী খৃস্টানরা এক সময় তাদের আকীদা থেকে দূরে সরে যায়। এখন তারাও বিশ্বাস করে যে হযরত ঈসা আ. ' র মধ্যে এমন দুটি প্রকৃতি বিদ্যমান রয়েছে , যেগুলোর একটি অপরটির সাথে মিশে গিয়েছে , অর্থাৎ বান্দা ও খোদা এবং সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা এক হয়ে গেছে। এ সংমিশ্রণে একটি একক সত্তা তৈরি হয়ে গেছে।

অথচ পূর্বের নাসতোরীদের বিশ্বাস ছিল , হযরত মাসীহাকে ইবনুল্লাহ বলা , তবে , বাস্তব অর্থে নয় , বরং এ অর্থে ,

আল্লাহ তাআলা তাঁকে ভালবাসার প্রিয়পাত্র বানিয়েছেন , তাঁকে প্রকৃত প্রভুর রূপ দেননি।

রোমের গির্জার পণ্ডিতরা যুগ যুগ ধরে নিজেদের বিরোধিদের আকীদা- বিশ্বাসের বিরোধিতা করে আসছিল। তারা তাদের বিরোধিদেরকে এ বলে কাফের বলে সম্বোধন করত যে , এদের অন্তরে ঈমানের প্রবেশ হয়নি !

নাসতোরীদের একত্ববাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার লোকেরা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থের জন্য কঠোরতা করে। কিন্তু পরবর্তিতে রাজনৈতিক পলিসিকে সামনে রেখে নম্রতা অবলম্বন শুরু করে। দুশমনদের জন্য নিজেদের দোয়ার খুলে দেয়, এবং তাদের পক্ষ হয়ে তাদের মতাদর্শের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করতে থাকে৷ যাতে তারা গির্জার পক্ষ থেকে দেওয়া পুরোনো অভিশাপগুলো ভুলে যায়। অন্যান্যদের মত গির্জার লোকদের সাথে তাদের কাজে অংশগ্রহণ করে । এবং এভাবে ধীরে ধীরে ক্ষমতাশীল গির্জা ও চার্চকে তাদের বন্ধু ভেবে এক সময় তাদের দলভুক্ত হয়ে যায়। আর বাস্তবেও তাই ঘটেছে।

খৃস্টানদের মাঝে মতপার্থক্যের মূল কারণ

মূল আকীদা- বিশ্বাসের ক্ষেত্রে খৃস্টানরা এক হওয়ার পরেও তাদের মাঝে মতানৈক্যর মূল কারণ হলো হযরত ঈসা আ. ' র ব্যক্তিত্বকে নিয়ে । এ নিয়ে তাদের মাঝে অনেক ধরণের মতাদর্শ পাওয়া যায়। যেমন ,

১. হযরত ঈসা আ. দু' টি প্রকৃতির মালিক।

২. অথবা তিনি দুই সত্তার অধিকারী। মানে , মানবীয় গুণাবলী থাকার পরেও তাঁর মাঝে ইলাহী গুণও রয়েছে , যে গুণের সুবাদে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় করার ক্ষমতা রাখেন ।

দ্বিতীয় আরেকটি কারণ হচ্ছে , রুহুল কুদসের অস্তিত্ব নিয়ে। রুহুল কুদস মূলত কোত্থেকে এসেছে , কী এর রূপ , এ বিষয়েও রয়েছে তাদের অনেক মতপার্থক্য। যেমন ,

১. তাদের কেউ কেউ বলে , রুহুল কুদসের অস্তিত্ব শুধু পিতা থেকে এসেছে।

২. কেউ আবার বলে পিতা , পুত্র দুইটা থেকেই এসেছে।

তাদের মাঝে মতবিরোধ তৈরির তৃতীয় আরেকটি মৌলিক দিক হলো , গির্জা এবং ধর্মীয় গুরুদের বিভিন্ন ব্যক্তিগত মতামত ও মনোবৃত্তির ইচ্ছাগুলোকে পবিত্র গ্রন্থের তাফসীর ও ব্যাখ্যা ধরা হবে কিনা , এ নিয়েও রয়েছে তাদের বিভিন্ন অভিমত। যা ধীরে ধীরে তাদের ধর্মীয় বিষয় হিসেবে স্থান পেয়ে গেছে !

এসব দল ও মতাদর্শ ছাড়াও খৃস্টানদের ইতিহাসে আরো বহু দল রয়েছে। যেমন , ইয়াকূবিয়াহ , নাসতূরিয়া, আরো কত কী ! কিন্তু বর্তমানে তারা বড় বড় প্রধান তিনটি দলে বিভক্ত:

১. ক্যাথোলিক

২. প্রোটেসটেন্ট

৩. অর্থোডক্স

বর্তমানে খৃস্টানদের বড় বড় প্রধান তিনটি দল

১. ক্যাথোলিক

এর অর্থ হলো , দল বা জামাআত। এদেরকে পশ্চিমা বা ল্যাটিনি চার্চও বলা হয়। এভাবে তাদেরকে পাতরিয়া রাসূলীও বলে। পাতরাস রাসূলীকে এ দলের মূল ভিত গণ্য করা হয়। তিনি হযরত ঈসা আ.' র একজন হাওয়ারী ছিলেন। রোমের পাদ্রি ও বিশপরা তার উত্তরসূরি ছিল। এরা পোপকে মাসীহার জানেশীন মনে করে। এবং পোপকে আল্লাহ তাআলার রাসূল

হিসেবেও মানে। এ কারণেই নাকি পোপের মতাদর্শে কোন রকমের সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কারণ পোপ ও পাদ্রিরা নাকি সমস্ত গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে থাকে।

ক্যাথোলিকদের সবচেয়ে বড় গির্জাকে ক্যাথোলিক গির্জা বা উম্মুল কানাইছ (প্রধান গির্জা) বলা হয়। ইটালি , বেইজিং , ফ্রান্স , স্পেন ও পুরতুগালে বিশেষকরে এদেরকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়। এদের অনুসারী পুরা বিশ্বেই বিদ্যমান। তাদের বিশ্বাস হলো, হযরত ঈসা আ. এর মাঝে দুটি প্রকৃতি রয়েছে : ১. সৃষ্টিকর্তার গুণ , ২. মানবীয় গুণ , অর্থাৎ হযরত ঈসা আ. এর মাঝে খোদা ও বান্দা মিলিত হয়ে গেছে। আর তাদের মতে , রুহুল কুদছের অস্তিত্ব বাপ- ছেলে উভয়ের থেকেই এসেছে।

রোমের ভ্যাটিক্যান পোপের মূল শহর। এ শহরই পোপ ও তার অনুসারীদের মূল অফিস। পোপের হাতেই নাকি খৃস্টানদের ভাগ্য নির্ধারণ হয়। ভ্যাটিক্যান শহরের পোপের জন্য সকল প্রকার স্বাধীনতা রয়েছে। এ শহরের পোপ স্বনির্ভরশীল। তার প্রেরিত দূতগণ পুরা বিশ্বে তার প্রতিনিধিত্ব করে। এরা খৃস্টানদের কল্যাণের বিষয়টি সব সময় লক্ষ রাখে। ভ্যাটিক্যানই মূলত খৃস্টান ধর্মের মূল চালিকাশক্তি এবং পশ্চিমা বিশ্বের ক্ষমতার প্রকৃত মহর।

ক্যাথলিকদের মতে ভ্যাটিক্যান একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থান। ১৬০০ শতাব্দী পর্যন্ত ক্যাথোলিকরা ছিল খৃস্টানদের সর্ববৃহৎ গোষ্ঠী। তবে বর্তমানে ফ্রান্স, ইটালি, বিলজিয়াম, স্পেন, পুর্তুগাল, মধ্য ও উত্তর আমেরিকা এবং ফিলিপাইনে ক্যাথলিকদের প্রভাব বেশি দেখা যায়। তবে , এশিয়া ও আফ্রিকাতে এদের সংখ্যা নেই বললেই চলে। এদের মতে খৃস্টান ধর্মের আলেমদের জন্য শকুরের গোশ্ত খাওয়া বৈধ।

২. প্রোটেস্ট্যান্ট

এই দলকে ইঞ্জীলী ফিরকা বলা হয়। এরা নাকি শুধু ইঞ্জীলের উপরই আমল করে , এটাই তাদের বিশ্বাস। এরা নিজেদেরকে অন্য কারো বুঝের মুখাপেক্ষী মনে করে না। অন্য কারো বুঝের অনুগতও মানে না। তাদের বক্তব্য হলো , পোপ ও পাদ্রিগণই শুধু ইঞ্জীলের ব্যাখ্যা করতে পারবে। তবে , তাদের ছাড়া অন্য কেউ ইঞ্জীল বুঝবে না এমনটা নয় ; বরং যোগ্য প্রতিটি ব্যক্তিরই তা বুঝবার সামর্থ্য আছে এবং তাদের জন্য সে অধিকারও রয়েছে । প্রোটেস্ট্যানরা চার্চ ও গির্জার প্রচণ্ড বিরোধিতা করে। কেননা চার্চের দাবি হলো , ইঞ্জীল বুঝার অধিকার শুধুমাত্র চার্চের রক্ষণকারীদেরই রয়েছে , তাছাড়া এরা নিজেদেরকে ঐশী বাণীর ধারকবাহকও মনে করে৷

প্রোসেস্ট্যান্টরা চার্চের এসব দাবি মানে না। এবং এরা সন্ন্যাস জীবন- যাপনেরও বিরোধি। অন্যদিকে এরাই আবার দ্বীনদার লোকদের জন্য বিবাহকে হারাম মনে করে । জার্মানি , ইংল্যান্ড, ডেনমার্ক, হোল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে ও দক্ষিণ আমেরিকায় এদের সংখ্যা বেশি।

প্রোটেসট্যান্টরা মূলত ক্যাথোলিক গির্জার একটি অঙ্গ সংগঠন ছিল৷ কিন্তু যখন পাদ্রিদের ইচ্ছা ও মনোবৃত্তি স্বাধীনচেতাদের বিরুদ্ধে চলে যায় , তখন এরা ক্যাথোলিকদের থেকে পৃথক হয়ে ভিন্ন দলে পরিণত হয়। এটা ১৫ বা ১৬ শো শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোন এক সময়ের ঘটনা। তখনকার " ধর্ম পরিশুদ্ধকরণ " আন্দোলনের যারা লিডার ছিলেন তাদের মধ্যে জার্মানের মারটিন এবং ইংলেন্ডের থমাস মুর অনেক প্রসিদ্ধ ।

Evangelicalism বা মিশনারি সোসাইটির ধর্মপ্রচার

ধর্মপ্রচার সিস্টেমকে প্রোটেসট্যান্টের একটি শক্তিশালী আন্দোলন বলা চলে। এর সূচনা ১৭০০ সনে হয় এবং ১৭৩০

তে পূর্ণতা লাভ করে। তখন একটি দল বিশ্বব্যাপি ইঞ্জীল প্রচার প্রসার করতে শুরু করে । এরা ইঞ্জীলের পুরোনো ভার্সনগুলোকেও মানে না।

তাদের মূল আকীদার বিষয় হচ্ছে চারটি :

১. মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া।

২. সমস্ত পবিত্র গ্রন্থের মাঝে ইঞ্জীলের শ্রেষ্ঠত্ব মান্য করা।

৩. ঈসা আ. এর সম্পর্কে শূলীতে চড়ানো এবং তাঁর পুনরায় জীবিত হওয়ার ঈমান রাখা।

৪. বাইবেলের শিক্ষাগুলোকে খুব ব্যাপকভাবে প্রকাশ ও প্রচার করা।

খৃস্টানদের তিনটি বড় বড় দল ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য করে আরো বিভিন্ন দল বের হয়েছে । তাদের মতপার্থক্য মূলত এই বিষয়টি নিয়েই বেশি হয়েছে ," তাছলীছ " (ত্রিত্ববাদ) এর আকীদায় হযরত ঈসা আ. ও তাঁর পিতার অবস্থানটা কী ? হযরত ঈসা আ. এর শরীর ও আত্মা দুজনই কি খোদা ? নাকি তাদের মধ্যে একজন খোদা , আর অপরজন মানব... ইত্যাদি , এ একটি আকীদাতেই তাদের মধ্যে এমন শত ধরণের মতামত পাওয়া যায়। এর স্থায়ী কোন দর্শন আজও কেউ পেশ করতে পারেনি ।

৩. অর্থোডক্স

এদেরকে প্রাচ্য বা গ্রীক চার্চ এবং রোম অর্থোডক্স খৃস্টানও বলা হয়। কেননা এদের অধিকাংশ অনুসারীরা পূর্ব রোম যেমন , রাশিয়া , বালকানের সাথে সম্পর্ক রাখে। তবে , এদের মূল ভিত ছিল তুর্কির কুসতুনতুনিয়া শহর । মুসলিমগণ কুসতুনতুনিয়া জয় করে নিলে সেখান থেকে তারা বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রে চলে যায় । এখন অর্থোডক্সরা রাশিয়াসহ মিসর, আবিসিনিয়া ও আফ্রিকার বড় বড় শহরের গির্জাসমূহ

পরিচালনা করে। তারা হারাম খানা খাওয়া পরিহার করে। তাই এরা রক্ত প্রবাহ ও যবেহ ছাড়া প্রাণী খাওয়াকে হারাম বলে৷ অথচ পশ্চিমা খৃস্টানরা এসবকে হালাল বলে থাকে এবং এগুলো খাওয়ার অনুমতিও দেয়৷

নিঃসন্দেহে এরাও রোমের ক্যাথোলিক চার্চের অধীনে ছিল। এদের মাঝেও মাসীহার প্রকৃতি ও নেচার নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। এর ফলে অনেক দল- মত তৈরি হয়েছে। এভাবে রুহুল কুদস নিয়েও মতপার্থক্য রয়েছে , তার অস্তিত্ব শুধু বাবা থেকে এসেছে নাকি বাবা, ছেলে দু' জনের মাধ্যমেই ? তবে, কুসতুনতুনিয়ার বাদশাহ এক সময় ঘোষণা করেছিলেন, রুহুল কুদসের অস্তিত্ব শুধু পিতা থেকেই এসেছে। এরপর রোমের গির্জার প্রধানরা তাকে ক্ষমতা থেকে বরখাস্ত করে ফেলে। এভাবে এ মতটাও দমে যায়।

অত:পর ৮৭৯ খৃস্টাব্দে কুসতুনতুনিয়াতে একটি কনফারেন্স হয় যা পূর্ব গ্রীক কনফারেন্স নামে পরিচিত। কিন্তু কনফারেন্সে পূর্ববর্তি বিভিন্ন মতাদর্শকে বাতিল বলে গণ্য করা হয়। এবং সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দেওয়া হয় , রুহুল কুদস এর অস্তিত্ব পিতা থেকে এসেছে। এরপর থেকে এ মতের অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবং বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধ হয়। এ সময় অন্যান্য দলগুলো একটি নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ হতে থাকে। তখন অবস্থা এমন ছিল , খৃস্টানদের এক দল অন্যান্য দলকে কাফের বলতে থাকে এবং প্রত্যেক দল নিজেদেরকে পবিত্র দাবি করে।

অর্থোডক্সের আকীদা- বিশ্বাস

" তারীখুল মাসীহিয়্যাহ ফী মিসর " নামক গ্রন্থে লেখক মিসরীয় গির্জাবাসীদের আকীদার বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন , আমাদের গির্জাসমূহ যেহেতু সবসময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তাই এর

ফায়সালা ভুল থেকে মাহফুয। আমাদের চার্চের সাথে সাথে হাবশী, আরমেনীয় , সিরিয়ান এবং অর্থোডক্স খৃস্টানরাও এটা বিশ্বাস করে , আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব মূলত তিন সত্তার সমষ্টি। তিনটি সত্তা বলতে ,

১. আল্লাহর সত্তা

২. ছেলের সত্তা

৩. রুহুল কুদসের সত্তা

আর দ্বিতীয় স্তরটি (ছেলের সত্তা) আবার ছেলে , রুহুল কুদস ও মারয়াম আ. এর সমষ্টি থেকে অস্তিত্ব পেয়েছে। পুত্রের স্তরটা মূলত এ তিনোটির সাথে মিলেই এক শরীর ও এক সত্তা হয়ে গেছে। আর পুত্রের অস্তিত্বে দু' ধরেণের ফিৎরত রয়েছে ,

১. মানবীয় প্রকৃতি

২. ইচ্ছা শক্তির অধিকার

মেরোনিয়া

এটি ইউহান্না মারোন এর দল বলে পরিচিত। ৬৬৭ খৃস্টাব্দে সর্বপ্রথম তিনি তার আকীদা প্রচার করেন। আর তা হলো , " হযরত ঈসা আ. এর প্রকৃতি যদিও দু' টা , কিন্তু এক খোদার মাঝে সে দু' টি মিশে যাওয়ার কারণে ইচ্ছা ও আকঙ্খা একটিই রাখেন। "

এই বক্তব্যের কারণে তিনি লোকমুখে অনেক পরিচিতি লাভ করেন৷ অত:পর কিছু পাদ্রিও একমত পোষণ করে তার সহযোগিতা করে। তবে , কেউ কেউ বিরোধিতাও করে। কিন্তু খৃস্টান পণ্ডিতদের কারণে তার মতাদর্শ বেশি প্রচার হতে পারেনি । তখন অনেকে রোমের বাদশাহ ইউগানাকোসকে পরামর্শ দেয় , তিনি যেন একটি কন্সফারেন্স অনুষ্ঠিত করেন এবং সেখানে এ আকীদার বিষয়টি জনসম্মুখে ফায়সালা করে

দেওয়া হয় , হযরত ঈসা আ. এর দুটি ফিৎরত রয়েছে এবং তার দুটি ইচ্ছা শক্তিও রয়েছে , মানবীয় ও ঈশ্বরীয় ।

অত:পর তাদের পরামর্শ অনুযায়ী ৬৮০ ঈসায়ীতে কুসতুনতুনিয়া শহরে খৃস্টানদের বিশাল বড় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় । এর একটা উদ্দেশ্য এটাও ছিল , " ইউহান্না রোমীকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করে তাকে লানত দেয়া হবে , যে ব্যক্তি তার বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবে তাকে কাফের গণ্য করা হবে , এবং যে ইউহান্না রোমীর ধর্ম মানবে তাকেও কাফের বলা হবে ।" এভাবে এ দলও নিজেদের প্রভাব হারায়।

এছাড়া এ কথাও স্পষ্ট , মারোনের অনুসারী অন্যদের চেয়ে সংখ্যায় দুর্বল ছিল । এবং তাদের এতটুকু মোকাবেলা করার সামর্থ্য ছিল না, অন্যদের জুলুম ও অত্যাচার থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে পারবে৷ তাই তাদের উপর অন্যান্য খৃস্টানরা আক্রমণ করলে তখন তাদের অধিকাংশই জুলুমের শিকার হয় । পালানোর পথ ছাড়া তাদের আর কোন উপায় বাকি থাকেনি । তখন তারা লেবাননের বিভিন্ন এলাকায় এসে আশ্রয় নেয় । এবং একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সেখানেই শান্তিতে জীবন যাপন করতে থাকে । অত:পর রাজনীতিতে কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হলে রোমের গির্জাবাসীরা তাদেরকে কাছে টানে । তখন তারা ক্যাথোলিক ধর্ম গ্রহণ করে তাদের সাথে মিলে যাওয়ার ঘোষণা দেয় । তবে নিজেদের কিছু সিদ্ধান্তে অটল থাকার শর্তে তারা ১১৮২ ঈসায়ীতে রোমের গির্জাবাসীদের সাথে একাত্মতার ঘোষণা করে। এদের অনেকে এখনো পর্যন্ত লেবানন পাহাড়ে বসবাস করছে। তাদের বিশেষ একজন পাদ্রি বা লিডার থাকে । যে তাদের সামাজিক পাদ্রি হিসেবে বিবেচিত হয় । তবে রাজনৈতিক ক্ষমতা শুধু রোমীয় লিডারের হাতেই থাকে ।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব

খৃস্টানদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন উৎসব রয়েছে , তবে এর মধ্যে দু' টি উৎসব তারা খুবই আনন্দ- উল্লাসের সাথে পালন করে থাকে :

১. ক্রিসমাস : এটি তাদের বাৎসরিক উৎসব। এতে সমস্ত খৃস্টানরা অনেক আনন্দ- স্ফূর্তি করে। তাদের কাছে এই দিনটি আমাদের ঈদের দিনের মতই। এটি প্রত্যেক বছর ২৫ ডিসেম্বর হযরত ঈসা আ. এর জন্ম বার্ষিকী হিসেবে পালিত হয়। এবং এ দিনে মিষ্টি বিতরণ , হাদিয়া উপহার দেওয়াসহ আরো বিভিন্ন পদ্ধতিতে খুশি প্রকাশ করা হয় । যা পূর্বেও বলা হয়েছে।

২. ইস্টার (Easter) : ঈসায়ীদের বিশ্বাস হলো হযরত ঈসা আ. শূলীতে চড়ানোর তিন দিন পর তিনি জীবিত হয়ে আসমানে চলে যান। আর তা ছিল ২১ মার্চের দিন। তাই এই দিনে প্রত্যেক বছর সবাই উৎসব পালন করে থাকে। তবে , কোন কোন দল আবার এই তারিখের পরবর্তী রবিবার এ উৎসব পালন করে ।

প্রিয় পাঠক ! একজন মুসলিম দাঈ হিসেবে খৃস্টানদের ইতিবৃত্ত ও তাদের ধর্মের পরিচিতি আমাদের জেনে রাখা ভালো। এতে উপরোক্ত বিষয়গুলো সামনে রেখে আমাদের জন্যে সত্য ধর্ম ইসলামের পক্ষে দালীলিকভাবে মানুষকে আহ্বান করা অনেক সহজ হবে ইনশাআল্লাহ ।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইসলামের দাঈ হিসেবে কবুল করুন! সত্য ধর্মকে বিশ্ব মানবের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে দেওয়ার তৌফিক দান করেন , আমীন !

সমাপ্ত

মিজানুর রহমান কাসেমী নদভী
শুক্রবার
সকাল ১১. ৫৯ মিনিট
আল মাহাদুল আলী আল ইসলামী হায়দারাবাদ
আট , নয় , দু' হাজার একুশ